মাসিক

আলোকধারা

রেজিঃ নং-২৭২
১৯শ বর্ষ
অষ্টম সংখ্যা
আগস্ট ২০১৪ ঈসায়ী

তাসাউফ বিষয়ে বহুমুখী গবেষণা ও বিশ্লেষণমূলক জার্নাল

ঈদ মোবারক

হযরত খাজা শেখ ফরিদ উদ্দিন গঞ্জেশকর (রহঃ)-এর মাজার শরীফ, পাক পাতওয়ান, পাকিস্তান।

পাকিস্তানের পাক পাতওয়ানে অবস্থিত হযরত খাজা শেখ ফরিদ উদ্দিন গঞ্জেশকর (রহঃ)-এর মাজার শরীফ

হযরত খাজা শেখ ফরিদ উদ্দিন গঞ্জেশকর (রহঃ)-এর মাজার জিয়ারতরত মুসল্লীদের একাংশ।

মাসিক
আলোকধারা
THE ALOKDHARA
A MONTHLY JOURNAL OF TASAWWUF STUDIES

রেজিঃ নং ২৭২, ১৯শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা

আগস্ট- ২০১৪ ঈসায়ী
শাওয়াল- জিলক্বদ- ১৪৩৫ হিজরী
শ্রাবন-ভাদ্র- ১৪২১ বাংলা

প্রকাশক
সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান

সম্পাদক
মোঃ মাহবুব উল আলম

যোগাযোগঃ
লেখা সংক্রান্তঃ ০১৮১৮ ৭৪৯০৭৬
০১৭১৬ ৩৮৫০৫২
মুদ্রণ ও প্রচার সংক্রান্তঃ ০১৮১৯ ৩৮০৮৫০
০১৭১১ ৩৩৫৬৯১

মূল্য : ১৫ টাকা
(US $=2)

সম্পাদকীয় যোগাযোগঃ
দি আলোকধারা প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স
সৈয়দ সলিমুল্লাহ্ শাহ্ রোড, বিবিরহাট
পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম-৪২১১। ফোনঃ ২৫৮৪৩২৫

শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) ট্রাস্ট-এর একটি প্রকাশনা

Web:www.sufimaizbhandari.org
E-mail:sufialokdhara@gmail.com

সূচী

■ সম্পাদকীয়ঃ
ঈদ মোবারক ---------- ২
■ সূফিবাদে ঈদুল ফিতরের তাৎপর্য ও শিক্ষা
– মাওলানা মোহাম্মদ নেজাম উদ্দীন চিশ্‌তী ---------- ৩
■ মাহে শাওয়াল এর তাৎপর্য ও সদকাতুল ফিতর
– সৈয়দ আবু আহমদ ---------- ৭
■ রমজান শেষে আনন্দের অধিকার ও অনুতাপের ভয়
– মুহাম্মদ ওহীদুল আলম ---------- ১০
■ ইসলামে যাকাতের গুরুত্ব এবং দারিদ্র্য বিমোচন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সঠিক যাকাত বন্টন নীতি বাস্তবায়নের রূপরেখা
– ড. মুহম্মদ আবদুল মান্নান চৌধুরী ---------- ১৩
■ শেখ ফরিদউদ্দিন মাসউদ গঞ্জেশাকর (রাহঃ) এর ফরিদপুরের আস্তানা
– ডাঃ এ. এন. এম. এ মোমিন ---------- ২১
■ আধ্যাত্মিক পথ ও পাথেয়
– অধ্যক্ষ আলহাজ্ব মাওলানা গোলাম মুহাম্মদ খান সিরাজী - ২৩
■ চেরাগে চাটগাম হাদিয়ে বাঙ্গাল হযরত পীর বদর আউলিয়া (ক.)
– এম মোখতার আলী ---------- ২৫
■ পীরের প্রতি আনুগত্য
– মোঃ গোলাম রসূল ---------- ৩০
■ শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীর খলিফা ও টীকা-ভাষ্যকার সৈয়দ নুরুল বখতেয়ার শাহ্
– ড. সেলিম জাহাঙ্গীর ---------- ৩১
■ ঈমান ও আখলাক ঃ পর্ব-১১
– সৈয়দ মুহাম্মদ ফখরুল আবেদীন রায়হান ---------- ৩৫
■ মাজারকেন্দ্রিক ধর্মপ্রচার এবং ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশমান রূপ
– জাবেদ বিন আলম ---------- ৩৯
■ গাজায় ইসরাইলের গণহত্যামিশন 'অপারেশন প্রটেক্টিভ এজ' ও মুসলিম দুনিয়ার নির্লিপ্ততা প্রসঙ্গ
– আবসার মাহফুজ ---------- ৪২

সম্পাদকীয়...

ঈদ মোবারক

রহমত, মাগফিরাত ও নাজাতের মাস রমজান শেষে আবার এলো ঈদুল ফিতর। বিশ্বের সকল মুসলিম পরম আত্মিক পরিশুদ্ধতা সহকারে এই উৎসব উদযাপন করবেন। ঈদ শব্দের অর্থ আনন্দ এবং এই শুভ্র আনন্দের বিধান এসেছে রাব্বুল আলামিনের কাছ থেকে। আল্লাহর নির্দেশে রমজানের একমাস সংযম, ধৈর্য ও সহনশীলতাসহ ব্যাপকতর অর্থে তাকওয়া অর্জনের পাশাপাশি অতিরিক্ত ইবাদত-বন্দেগীর মাধ্যমে অতিবাহিত হয়েছে। মহানবী (দ.) মদীনায় হিজরতের পর এই উৎসবের প্রবর্তন করেন নয়া জীবন ও সমাজ বিধানের অংশ হিসেবে। অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল তাঁর অনুসারীদের সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য নির্দেশ করা। এই সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য আবার স্বতন্ত্র জীবন বিধানের বিভায় ভাস্বর।

কঠোর সিয়াম সাধনার মাস রমজান পার হয়ে ঈদুল ফিতরের দিন যেসব ফরজ বা বাধ্যতামূলক কাজ করতে হয়, সেগুলোর মধ্যেও রয়েছে সমাজে অর্থনৈতিক ব্যবধান ঘুচানোর কর্মসূচী। ইসলাম এমনিতেই একটি অর্থনৈতিক ধর্ম, যে ধর্ম মানুষের ব্যক্তিকেন্দ্রিক স্বার্থপরতা এবং এর বিপরীত ক্রমে অন্তর্জাত পরার্থপরতার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করে। সভ্যতার সূচনাকাল থেকে সমাজে আর্থিক ব্যবধান ছিল। সে ব্যবধান কালক্রমে দুঃসহ পর্যায়ে পৌঁছে। অপরের শ্রম ও সম্পদ অপহরণ ও লুণ্ঠন, বঞ্চনা প্রভৃতি সামাজিক রেওয়াজে পরিণত হয়। এ অসাম্য ও অনাচার মানবতাকে ধ্বংস করতে উদ্যত হয় এবং মানুষের মানবিক গুণাবলী বিকাশের পথে নিদারুণ অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। মহানবী (দ.) এই আর্থ সামাজিক ব্যবধান ঘুচানোর এবং মানবতাকে একই সমতলে দাঁড় করানোর কর্মসূচী নিয়ে সুদূর প্রসারী সংগ্রামে অবতীর্ণ হন। যাকাত প্রথা যা ইসলাম ধর্মের অনুসারীদের জন্য বাধ্যতামূলক এ পথে এক স্থায়ী পদক্ষেপ। সম্পদের সুষম বন্টনকে ধর্মীয় কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত করার এ কর্মসূচী অন্যত্র পাওয়া যাবে না। মানুষে মানুষে বর্ণভেদ ও সামাজিক ভেদের অবসানের কথাও ইসলাম শুরুতেই ঘোষণা করেছে।

এগুলো স্রেফ মানবিক আচরণের মাধ্যমে সহজে সম্ভব। কিন্তু অর্থনীতির বিষয়টা যেহেতু জটিলতর ব্যাপার, সেহেতু এটাকে একটা সামাজিক প্রক্রিয়াবদ্ধ করা দরকার ছিল। তাই যাকাত, ফিতরা প্রভৃতিকে ইসলাম ধর্মীয় ও নৈতিকভাবে বাধ্যতামূলক করেছে, যা থেকে নিজেকে বিরত রাখার কিম্বা পশ্চাদাপসরনের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই। ঈদের দিনে প্রথমেই ফিতরা প্রদান করতে হয় এবং তা করতে হয় ওয়াজেব নামাজ আদায় করার আগে। সদকাতুল ফিতর বা ফিতরা প্রদানের বিধান এমনভাবে করা হয়েছে, যাতে ফিতরার মাধ্যমে বন্টিত অর্থ দরিদ্র মুসলিমদের হাতে পৌঁছে যায় এবং তারা নিজ নিজ অবস্থানে থেকে আনন্দ উৎসবে শরীক হতে পারে। এভাবে ইসলাম মানবিক সহমর্মিতা ও সাম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গীর শিক্ষা দেয়। এখানে উল্লেখ্য যে, ইসলামের দুটো প্রধান ধর্মীয় উৎসবের কোনটাতেই অপচয়মূলক আনন্দ উল্লাস-ফূর্তি-লাগামহীন-উদ্দেশ্যহীন নৃত্য গীতের অবকাশ নেই। এর কারণ হচ্ছে ইসলামী দর্শন মতে মানবজীবন মানুষের কাছে আল্লাহর পবিত্র আমানত। এই মহান আমানত ও নেয়ামতের কেমন সদ্ব্যবহার মানুষ করবে তার নীতিমালা ঘোষণা করা হয়েছে এবং এই ঘোষণা মোতাবেক মানবিক গুণাবলীর বিকাশের সাধনাই মানুষের জীবনের পরম লক্ষ্য। সমগ্র মানবজাতিকে নিয়ে পৃথিবীতে জান্নাত রচনার সাধনাই ইসলামী জীবন দর্শনের মূলকথা। অতএব, এখানে জীবনের এতটুকু সময়ের অযথা অপচয়, ভোগবাদী উদ্দেশ্যহীন আনন্দ উল্লাসের মধ্যে নষ্ট করার অবকাশ কোথায়?

রমজান মাসে তারাবীর নামাজ, ঈদুল ফিতরের নামাজ তথা জামাতের মাধ্যমে বৃহত্তম মুসলিম সমাজের আন্তঃসম্পর্ক ও মানবিক বন্ধন জোরদার করার উপকরণ রয়েছে। নিজেদের মধ্যকার সকল সমস্যা সম্পর্কে আলোচনাপূর্বক সমাধানের প্রশস্ত অবকাশও এসব আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে রয়েছে। আজ বাংলাদেশে একদিকে অনটন জর্জরিত, দুর্দশা কবলিতদের আহাজারী আর অন্যদিকে অধিকতর সুযোগপ্রাপ্ত সৌভাগ্যবানদের উল্লাসের এক অনাকাঙ্ক্ষিত বৈপরিত্যের মধ্যে ঈদ উদযাপিত হতে যাচ্ছে। এটা ইসলামী সমাজে বাঞ্ছনীয় নয়। ইসলামী জীবন বিধান মানেই মানুষে মানুষে সম্পদের বৈষম্য দূরীকরণ, আজকের পরিভাষায় দারিদ্র দূরীকরন। এ জটিল ও কঠিন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করতে হলে কেন্দ্রীয় সমন্বিত কার্যক্রম দরকার। প্রকৃত প্রস্তাবে যাকাত ভিত্তিক কর্মসূচী দারিদ্র জর্জরিত বাংলাদেশের ব্যাপক অভাবী জনগণের দারিদ্র বিমোচনের ক্ষেত্রে স্থায়ী অবদান রাখতে পারে। আমরা পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে বাংলাদেশে একটা সুখী-সমৃদ্ধ সমতা ভিত্তিক সমাজ কামনা করি। আমরা আশা করবো সমতাভিত্তিক সমাজ, যে সমাজের রূপরেখা মহানবী (দ.) বিশ্ববাসীর সামনে পেশ করে গেছেন, তার পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নই হোক আমাদের আজকের অঙ্গীকার। আমরা সমগ্র বিশ্বমানবতার শান্তি-সমৃদ্ধি ও কল্যাণ চাই। এটা ইসলামী দর্শনের মূলকথা।

মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফের গাউসিয়া হক মঞ্জিল এই চেতনাকে সামনে রেখে ঈদ উপলক্ষ্যে দারিদ্র্য বিমোচনসহ বিভিন্ন কল্যাণমূলক দীর্ঘ মেয়াদী কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। মানুষকে অভাব ও অকল্যাণ মুক্ত করা মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফের অন্যতম আধ্যাত্মিক প্রেরণা। আশাকরি এসব কর্মসূচীর প্রতি আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের মেহেরবানী বর্ষিত হবে। আমীন! ঈদ মোবারক।

সূফিবাদে ঈদুল ফিতরের তাৎপর্য ও শিক্ষা

• মাওলানা মোহাম্মদ নেজাম উদ্দীন চিশ্‌তী •

আল্লাহু আকবর, আল্লাহু আকবর, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবর, আল্লাহু আকবর ওয়া লিল্লাহিল হামদ। দীর্ঘ একটি মাসের সিয়াম সাধনার পর মুসলিম মিল্লাতের দরওয়াজায় এসেছে ঈদুল ফিতর পুরস্কার প্রাপ্তির মহানন্দের দিন। যারা রাব্বুল আলামীনের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য পূর্ণমাসব্যাপী আহার বিহার কাম রিপুকে নিয়ন্ত্রণ করেছেন, কুরআন তেলাওয়াত করেছেন, নামাজে তারাবিহ পড়েছেন, ইবাদত রিয়াজত করেছেন, তাঁদের জন্য আজ 'ইয়াওমুল জায়িজা' বা সমাবর্তন দিবস। এটি মুসলমানদের জন্য খুশির দিবস। এই খুশী খোদা প্রদত্ত বিধান পালনের জন্য। তাইতো ঈদের নামাজের খুৎবায় খতিবের কণ্ঠে উচ্চারিত হয় 'ঈদুল লিল আবরার ওয়া ঈদুন লিল ফুজ্জার' অর্থাৎ আজকের আনন্দ আবরার বা পূণ্যবানদের জন্য আর ফাজের বা বদকারদের জন্য নিরানন্দ তথা শাস্তির কড়া। কারণ ওরা খোদা প্রদত্ত তাকওয়ার প্রশিক্ষণ নিতে ব্যর্থ হয়েছে। অতএব 'ঐ ব্যক্তির জন্য ঈদ নয় যে নতুন কাপড় পরিধান কারেছে, বরং ঈদ ঐ ব্যক্তির জন্য যে পরকালকে ভয় করেছে। ঈদ মুসলিম সংস্কৃতির একটি অন্যতম দিকনির্দেশনা। পাশ্চাত্যের অনাচার সভ্যতার ন্যায় মুসলমানদের জন্য র‍্যাগডে এর অনুমতি নেই। ইসলামী সভ্যতার আগমনের পূর্বে মদিনাবাসীরা দুটি খুশীর দিন পালন করত। একটির নাম নওরোজ, অন্যটির নাম মেহেরজান। এগুলো মজুছী সভ্যতার অন্তর্ভুক্ত। হিজরতের পর প্রিয় নবী (দ.) তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন– 'এ দুটি দিন কিরূপ? তারা বলল, 'আমরা এই দুটি দিনে জাহেলিয়াতের জমানায় আনন্দ করতাম। তখন প্রিয় নবী (দ.) এরশাদ করলেন 'মহান আল্লাহ এ দুটি দিনের পরিবর্তে তার চেয়েও উত্তম দুটি দিবস দিয়েছেন একটি ঈদুল আজহা, আর অন্যটি ঈদুল ফিতর। (সুনানে আহমদ, আবু দাউদ)।

ঈদুল ফিতরের তাৎপর্য ও শিক্ষা: ঈদ আরবী শব্দ এর অর্থ খুশী। যা বার বার ফিরে আসে। এদিনটিকে ঈদ আখ্যায়িত করার কারণ হলো, এতে মানুষ আল্লাহর আনুগত্য অর্থাৎ রমজানের ফরজ রোজা সমাপন করে প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্যের দিকে ফিরে আসে। অর্থাৎ তারা এখন শাওয়ালের 'ছয় রোজা' রাখার প্রস্তুতি নেয়। ঈদ এজন্যও বলা হতে পারে যে দিনটি প্রতি বছর ঘুরে ফিরে আসে। এটাও কারণ হতে পারে যে, এতে আল্লাহ তায়ালা বারংবার দয়া ও দান এর ভাণ্ড খুলে দেন। ঈমান আনার পর একজন মু'মিন নামাযের মাধ্যমে নিজের অস্তিত্বকে সম্পূর্ণভাবে সমর্পন করে সিজদার মাধ্যমে শরীরের সবটুকু গর্ব বড়াই বিলীন করে। সাথে সাথে প্রমাণ করে তার শরীর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যের জন্য সদা প্রস্তুত। যাকাতের মাধ্যমে সে ঘোষণা দেয় এ মাল সম্পদ কিছুই তার নয় সবটুকুর মালিক আল্লাহ তা'আলা। সে শুধু সাময়িকভাবে আত্ম সচেতন হলেও তার অস্তিত্বে বিদ্যমান রিপু সমুহের তাড়নায় তার মধ্যে আমিত্ব, গর্ব বড়াই, কামভাব, ক্রোধ, লোভ ইত্যাদি বিরাজমান থাকে। মাহে রমজানের সিয়াম সাধনার মাধ্যমে এসব রিপুকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে। তার গুনাহ সমূহ নামায যাকাত ও রোজার মাধ্যমে ছাই করার পর তার পাশবিক শক্তি দমিত হয়ে মানবিক শক্তি অদম্য এক শক্তিতে পরিণত হয়। কদরের ইবাদত, ইতিকাফের আমেজ ঈদের পূর্ব রাতের দোয়া কবুলের সুযোগে সে নিজেকে নিষ্পাপ করে খাঁটি মানুষে পরিণত করতে সক্ষম হয়। মাহে রমজানে আল্লাহ তা'আলার মেহমান হিসেবে আল কুরআনের শিক্ষা নিজের জীবনের সর্বত্র ধারন করার যোগ্যতা অর্জন করে। কুরআনের সঙ্গে নিজেকে রঙ্গিন করে আল কুরআনের সমাজ গড়ে তোলার দ্বীপ্ত শপথ গ্রহণ করে। উপবাস থেকে গরীব দুঃখীদের দুঃখ কষ্ট অনুভব করে। ইফতারের মেহমানদারীতে নিজেকে মেজবান হিসেবে পেশ করে। সাদকাতুল ফিতরের মাধ্যমে সাদকা করার অভ্যাস গড়ে উঠে। যাকাতের নেসাব পরিমাণ হলেই প্রতিজন ব্যক্তি এমনকি ঐ দিনে জন্ম গ্রহণকারী শিশুর পক্ষ থেকেও সাদকা দেয়া হয়। গুনাহমুক্ত অবস্থায় সকল রোযাদার ও তাদের পরিবারের সদস্যগণ মহানন্দে ঈদের জামাতে হাজির হয় ঈদের ময়দানে। খোৎবার মাধ্যমে গোটা রমযানের শিক্ষা ও ভবিষ্যত জীবনে রোযাদারের করণীয় তুলে ধরা হয়। এক কথায় ঈদুল ফিতর এতই তাৎপর্যবহ যা একজন মু'মিনের জীবনকে পরিবর্তন করে দেয়। কিন্তু যে ব্যক্তি শারীরিক শক্তি থাকা সত্ত্বেও রোযা রাখেনি। আল্লাহ

তা'আলার অলঙ্ঘনীয় ফরয তরক করতে সামান্যতম চিন্তাও করেনি। আল্লাহ তা'আলার হাজারো নেয়ামত ভোগ করে তার ইবাদত বাদ দিয়ে ভোগ বিলাসে মত্ত থেকে নাফরমানীতে লিপ্ত ছিল। আল্লাহ তা'আলা যে, সব কিছু জানেন, দেখেন, খবর রাখেন ঐ ঈমান তার ছিলনা। যদি ঈমান থাকতো তাহলে প্রকাশ্যে তো দুরে থাক গোপনেও সে রোযা ভাঙ্গার মতো কবিরা গুনাহ করতে সাহস করতনা। আজকে ঈদের দিন তার জন্য দুঃখের দিন, অনুতপ্ত হওয়ার দিন। সে এমন ব্যক্তি যে নিজের সাথে প্রতারণা করেছে, নফসের উপর জুলুম করেছে, নিজের গুনাহ ক্ষমা পেয়ে আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভের সুযোগ হেলায় হারিয়েছে এ জন্য ঈদের দিন তার জন্য হবে দুর্দশা ও অসহায়ত্বের দিন।

ليس العيد من لبس الجديد وانما العيد من يخاف الوعيد

অর্থাৎ: নতুন পোশাক পরিধানকারীর জন্য ঈদ নয় বরং ঈদ হলো যে পরকালীন শাস্তিকে ভয় করেছে।

সুফিবাদে ঈদের গুরুত্ব: মুসলমানদের ঈদ নিছক আনন্দ উৎসব নয় বরং এর বাহ্যিক দিক অপেক্ষা আত্মিক দিকটাই প্রধান। এ দুটি অনুষ্ঠান ভ্রাতৃত্ব ও আত্মত্যাগের মহিমায় সমুজ্জল। এর স্বকীয়তা হলো প্রতিটি বিধানই আমাদের জন্য কল্যাণকর ও তাৎপর্যবহ। ধারাবাহিক এক মাস পরীক্ষা দেওয়ার পর যখন ফলাফল সফলতার মাধ্যমে প্রকাশ পায়, তখন সেই দিন স্বাভাবিকভাবে খুশী এবং প্রফুল্লতার দিন হয়ে থাকে। আর এ পরীক্ষাটা হল আত্মা পরিশুদ্ধতার পরীক্ষা। এক মাস সিয়াম সাধনার মাধ্যমে আত্মাকে পরিশুদ্ধ করতে পারলেই অর্জিত হয় সফলতা। তাই পবিত্র কুরআনুল করিমে রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেছেন, قد افلح من تزكى নিশ্চয় সাফল্য লাভ করবে সে, যে শুদ্ধ হয়। (সূরা আল আলা, আয়াত: ১৪) যে সফলতা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আসে, তাতেই বাস্তব খুশি অর্জিত হয়। কারণ এই সফলতা অবিনশ্বর, যা কখনো বিলীন হবে না। তাই সুফিয়ায়ে কিরামগণ বাহ্যিক আনন্দ, সৌন্দর্য্য পরিহার করে আধ্যাত্মিক চিন্তা চেতনায় সর্বদা মশগুল থাকেন, যার প্রমাণ আমরা ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ফারুকে আযম (রা.) এর জীবনীতে পেয়ে থাকি। বর্ণিত আছে হযরত ওমর ফারুক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু আমিরুল মু'মেনীন হওয়ার পর এক ঈদুল ফিতরের দিন সকাল বেলায় অঝোরে কাঁদতে থাকেন। সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞেস করলেন "হে আমিরুল মু'মেনীন আজ ঈদের দিন আপনি কাঁদছেন কেন? উত্তরে তিনি বললেন, ঈদতো সে ব্যক্তির জন্য যার মাহে রমজানের রোজা ও ইবাদত বন্দেগী আল্লাহর দরবারে কবুল হয়েছে। ঈদতো তাঁর জন্য যে গুনাহ মুক্ত হয়েছে। আমার আশংকা রয়েছে যদিও মাহে রমজানের রোজা পালন করেছি এবং যা কিছু ইবাদত করেছি তা আল্লাহর দরবারে কবুল হয়েছে কিনা। যদি কবুল হয়ে থাকে তাহলে শোকরিয়া আদায় করব, আর যদি কবুল না হয় তাহলে আমার মতো দুর্ভাগা আর কেউ নেই। এ ভয়ে আমি কাঁদছি।

এ ঘটনায় স্পষ্ট প্রমাণ হয় যে যিনি রোজার হক আদায় করেছেন তারও কোন ফল হবেনা যতক্ষণ না আল্লাহ তা'আলার দরাবারে কবুল হয়। এটা তাসাউফপন্থীদের চিন্তাধারা, সুফি সাধকগণ মালিকের রেজামন্দির প্রতি সর্বদা নিয়োজিত থাকেন, আর সাধারণ মুসলমানগণ রোজা পালন করুক বা না করুক গরীবরা টাকা ধার করে বা ধনীরা মার্কেট থেকে নতুন কাপড় সেমাই, চিনি কিনে আনন্দের সাথে ঈদ পালন করে থাকে অথচ ঈদ হল রোজাদারের জন্য মালিকের পক্ষ থেকে একটা বোনাস। আমাদের দেশে দীর্ঘ দিন কোন পয়সা ওয়ালার অধীনে চাকরী করলে সে যেভাবে তার অধিনস্থ কর্মচারীকে বছর শেষে বোনাস দেয় তেমনি ভাবে রাব্বুল আলামীনও তাঁর বান্দাদের জন্য বছরে কয়েকটি বোনাসের ব্যবস্থা করেন, যেমন: লাইলাতুল বরাত, লাইলাতুল কদর, লাইলাতুল মেরাজ, ঈদুল ফিতর, ঈদুল আযহা ইত্যাদি। সুফি সাধকদের মতে ঈদ হল মালিকের রেজামন্দির দিন, মালিকের ইয়াদগারির দিন, আল্লাহর রাস্তায় ছদকা করার দিন, গুনাহ মাফ চাওয়ার দিন, মালিকের দিদারের দিন, অপ্রিয় হলেও সত্য নবী করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হুঁশিয়ারী বাণী সত্ত্বেও আমাদের বোধোদয় হচ্ছেনা বরং আমরা প্রতিনিয়ত অনিষ্টের মধ্যে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হচ্ছি। ঈদ এলেই দেখা যায় এক শ্রেণীর লোক আনন্দ ফুর্তি ও বিলাসে মত্ত হয়ে পড়ে। যারা সারা বছর আল্লাহর বিধানকে অবজ্ঞা ও উপেক্ষা করে চলছে। পুরো রমজান মাসটাই ভোজ ফুর্তির বেহিসাবী গড্ডালিকা প্রবাহে নিজেদেরকে ভাসিয়ে দিল, তাদেরকেই দেখা যায় ঈদের মহান উৎসবে মেতে উঠতে। তাদের ঘরেই বসে ভোগ বিলাসের বেশী আয়োজন। তাদের মধ্যেই দেখা যায় সাজ সজ্জার অসহনীয় প্রতিযোগিতা। কে কার চেয়ে

অধিক মূল্যের পোশাক পরিচ্ছদে সুসজ্জিত হয়ে অপরের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে তারই চলে চেষ্টা আর সুফিরা চান শুধু আল্লাহর রেজা বা সন্তুষ্টি তাই তাঁরা নতুন পোশাক, উন্নত খানা পিনা সাধারণ মানুষের মন্তব্যের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করেননা। হযরত ছিররে ছকতী বর্ণনা করেন, এক ঈদের দিনে আমি হযরত মারুফ কারখীর বাড়ীতে গিয়ে দেখলাম, তিনি নিজহাতে বাগান হতে খেজুর তুলছেন। পাশেই একটি অল্প বয়স্ক বালক দাঁড়িয়ে রয়েছে। জিজ্ঞেস করলাম হুজুর! আজ ঈদের দিনে খেজুর তোলার প্রয়োজন হল কেন? জবাব দিলেন, এই বালকটি এতিম সে এসে বলল, আজ ঈদের দিনে তাদের ঘরে কিছুই নেই। অন্যান্য ছেলেরা নতুন কাপড় পরে খেলা করছে, কিন্তু তাকে কেউ কিছু দেয়নি। আমি এই খেজুর বিক্রয় করে তাকে অন্তত একটা খেলনা কিনে দিতে চাই। আমি বললাম হুজুর আপনার আর কষ্ট করার দরকার নেই। আমি তাকে সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। ছেলেটিকে সঙ্গে করে এনে নতুন কাপড় এবং খেলনা কিনে দিলাম, ছেলেটি আনন্দে নাচতে নাচতে হযরত মারুফের সম্মুখ দিয়ে চলে গেল। আমি লক্ষ করলাম এরপর হতে আমার অন্তরের বন্ধ দুয়ার যেন খুলে গেল। অনেক দিন সাধনা করেও আমি যতটুকু নুর অর্জন করতে পারিনি, এই একটি মাত্র কাজ করেই যেন তা হাছিল হয়ে গেল। (দরবারে আউলিয়া, পৃষ্ঠা ৬২) এক ঈদের দিন হযরত ওমর (রা.) স্বীয় পুত্রের পরণে জীর্ণ কাপড় দেখে কাঁদতে শুরু করেন। তখন পুত্র তাঁকে জিজ্ঞেস করে বললেন, আব্বাজান আপনি কেন কাঁদছেন? তিনি বললেন: বৎস! আমার মনে ভয় হচ্ছে যে, আজকের ঈদের দিন অন্যান্য ছেলেরা যখন তোমার পরনে পুরাতন কাপড় লক্ষ্য করবে তখন হয়ত তোমার মন ভেঙ্গে যাবে। পুত্র জবাবে বললেন, মনতো তাদেরই ভাঙ্গার কথা যারা খোদার সন্তুষ্টি লাভ করতে পারেনি কিংবা নিজ মাতা পিতার অবাধ্য হয়েছে। আমিতো আশা করছি যে আপনার সন্তুষ্টির কারণে আল্লাহ তা'আলা আমার উপর সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন। একথা শুনে হযরত ওমর (রা.) আনন্দে কেঁদে ফেললেন এবং পুত্রকে আলিঙ্গন করলেন এবং তার জন্য দোয়া করলেন। জনৈক আরবী কবি চমৎকার বলেছেন, লোকেরা আমাকে জিজ্ঞাসা করে, ঈদের দিন তুমি কী পোশাক পরিধান করবে? বলি, যে পোশাক পরিধান করলে কয়েক ঢোক পান করা যায়– দারিদ্র্য ও ছবর এ দুই পোশাকের মাঝখানে এমন একটি দিল অবস্থান করছে, যে দিলটি প্রতি ঈদে ও জুমাতে আল্লাহ তা'আলার দীদার লাভ করে থাকে।

العيد لي ما لم ان غبت يا املي
والعيد ان كنت لي مرأى ومستمعا

"হে প্রেমাস্পদ! তুমি ব্যতীত আমার ঈদ আনন্দ নয় বরং তা শোক বিলাপ। প্রকৃত ঈদ আমার হবে যদি হে মাহবুব তোমার দর্শন লাভ করতে পারি এবং তোমাকে কিছু শোনাতে পারি' (মুকাশাফাতুল কুলুব ৩৬৬ পৃষ্ঠা) তাই আউলিয়ায়ে কেরামগণ ঈদের দিন নামাজ শেষ হওয়ার পর মাহফিলে ছেমার মাধ্যমে মুর্শিদের শানে গজল গাইতেন, গান করতেন, তার প্রমাণ পাই আমরা রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর পবিত্র হাদীস শরীফে,

عن عائشة رضي الله عنها قالت ان ابابكر دخل عليها وعندها جاريتان في ايام منى تدفعان وتضربان وفي رواية تغنيان بما تقاولت الانصار يوم بعاث والنبي ﷺ متغش بثوبه فانتهرهما ابوبكر كشف النبي ﷺ عن وجهه فقال دعهما يا ابا بكر فانها ايام عيد وفي رواية يا ابابكر ان لكل قوم عيد او هذا عيدنا۔

অর্থাৎ: হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, এক ঈদের দিনে তাঁর পিতা হযরত আবু বকর (রা.) তাঁর গৃহে প্রবেশ করেন। এই সময় দুইজন মেয়ে দফ বাজাচ্ছিল। আরেক বর্ণনায় আছে তারা বোয়াস যুদ্ধের দিনে প্রদর্শিত আনসারগণের বীরত্ব গাথা গেয়ে শুনাচ্ছিল। আর রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা চাদর দ্বারা নিজ মুখ ঢেকে শুয়েছিলেন। অতঃপর হযরত আবু বকর (রা.) ওই দুই মেয়েকে ভর্ৎসনা করলে প্রিয় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা তাঁর মুখমণ্ডল মোবারক চাদর হতে বের করে এরশাদ করলেন, 'হে আবু বকর, তাদেরকে ছেড়ে দাও। আজকে ঈদের দিন' অপর এক বর্ণনায় আছে, 'হে আবু বকর নিশ্চয়ই সকল জাতির জন্যে ঈদের দিন আছে এটা আমাদের ঈদ'। (বুখারী শরীফ ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৮৩-১৮৪, মুসলিম শরীফ, মিশকাতুল মাসাবীহ, সালাতিল ঈদাঈন)

বাজনা সহ গান অথবা ব্যতীত গান হালাল হওয়া সম্পর্কে ছুফীয়ায়ে কেরাম এই ছহীহ হাদীসটিকে দলিল স্বরূপ গ্রহণ করেছেন।

ঈদের দিনের ধর্মীয় গুরুত্ব: হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু

থেকে বর্ণিত ঈদের দিন আল্লাহ তা'আলা আপন রোযাদার নেক্কার বান্দাদের নিয়ে গর্ব করেন, আর ফিরিশতাদের উদ্দেশে বলেন, ওহে ফিরিশতারা বল, ওই মাজদূরকে কী পারিশ্রমিক দেওয়া যেতে পারে, যে তার উপর নির্ধারিত কাজ ভালভাবে আঞ্জাম দিয়েছে? ফিরিশতাগণ আরজ করেন, হে আল্লাহ! তার পুরস্কার (প্রতিদান) হচ্ছে মজদুরকে তার পারিশ্রমিক পূর্ণাঙ্গ রূপে দেওয়া হোক। তখন আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, হে ফিরিশতারা শোন! আমার বান্দারা (নারী-পুরুষ) আমার বিধান পুরোপুরিভাবে পালন করেছে। এটা শুনে ফিরিশতারা সরবে 'লাব্বায়ক' বলে বান্দাদের আমলের কথা স্বীকার করেন, তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমার শপথ আমার সম্মান, মহত্ব, দানশীলতা, বাদান্যতা, উচ্চ মর্যাদা ও উচ্চ প্রশংসার! আমি রোযাদার বান্দাদেরকে যারা ঈদের দিনে দোয়া করে, তাদের দোয়া গুলো কবুল করে নেব। আর ঘোষণা করব যাও বলে দাও, 'হে আমার বান্দারা! আমি তোমাদের গুনাহগুলো ক্ষমা করে দিলাম। আর তোমাদের গুনাহগুলোকে নেকীতে পরিবর্তিন করে দিলাম' বর্ণনাকারী হযরত আনাস বলেন, রোযাদারগণ যারা ঈদের দিন দো'আ করে, তাদের দো'আ কবুল হয়, আর এ ক্ষমা প্রাপ্ত বান্দাগণ নিজেদের গুনাহ সমূহ থেকে পাক সাফ হয়ে ঈদগাহ থেকে আপন আপন ঘরে ফিরে যায়। (বায়হাক্বী, কৃত শুআবুল ঈমান, মিশকাত শরীফ ইত্যাদি)

ঈদের দিনের করনীয়: ১. ঈদের নামাযের পূর্বেই সাদকাতুল ফিতর আদায় করা। যার উপর যাকাত ফরজ অর্থাৎ প্রয়োজনীয় অর্থ ছাড়া সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ বা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপা বা সমপরিমানের অর্থ ঐ দিন জমা থাকলে সাদকাতুল ফিতর দেয়া ওয়াজিব। যে ব্যক্তির উপর সাদকাতুল ফিতর ওয়াজিব তার পরিবারের সকল সদস্য এমনকি ঐ দিনে যে শিশুটি ঈদের নামাজের পূর্বে জন্ম গ্রহণ করেছে তারও সাদকাতুল ফিতর আদায় করতে হবে। ২. ঈদের দিনে নতুন পোশাক পরিধান করা সুন্নাত। ৩. আতর বা সুগন্ধি লাগিয়ে ঈদের নামাযে যাওয়া মুস্তাহাব। ৪. ঈদুল ফিতরে যাওয়ার আগে কিছু মিষ্টি খাওয়া মুস্তাহাব। ৫. ঈদের জামায়াতে যাওয়ার সময় মনে মনে তাকবীর পড়া সুন্নাত। ৬. ঈদের নামাযে যে রাস্তা দিয়ে যাবে ফেরার সময় ভিন্ন রাস্তা দিয়ে আসা সুন্নাত। ৭. ঈদের দিনে হিংসা বিদ্বেষ পরশ্রীকাতরতা, মনোকষ্ট ভুলে গিয়ে পরস্পরের মুসাফাহা, মুয়ানাকা ও দোয়ার মাধ্যমে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া ঈদের অন্যতম কাজ। ৮. ঈদের নামাজে আযান, ইকামত নেই। ছয় তাকবিরের সাথে দুই রাকাত ঈদের নামাজ আদায় করতে হবে জামাতের সঙ্গে। এরপর খোৎবা শুনতে হবে।

শেষ কথা: এখন আমাদের ভাববার সময় এসেছে। আর অর্থহীন ঈদ উৎসব নয়। এখন খুঁজে বের করতে হবে সুন্দর সাবলীল গ্রহণযোগ্য অর্থপূর্ণ ঈদ উৎসব। আমাদের আত্মোপলব্ধির মাধ্যমে সচেতন হবে। ঈদুল ফিতরের উৎসব কেবল বস্ত্র পরিধানের প্রতিযোগিতা নয় কিংবা সেমাই পোলাও বা কোন সুস্বাদু খাদ্য ভক্ষণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখলেই চলবে না কিংবা আনন্দ হৈহুল্লা করে কাটালেই চলবেনা। বস্তুত ঈদুল ফিতর নিছক কোন অনুষ্ঠানিকতার নাম নয়। একটি সামাজিক রীতি-নীতি কিংবা আচার অনুষ্ঠানের নামও নয়। এটি ধর্মীয় বিধি বিধান সম্বলিত একটি ইবাদতের নাম। তাই একে জাহিলী যুগের 'নওরোজ' কিংবা 'মেহেরজান' অথবা আধুনিক যুগে নববর্ষ ও বড় দিনের উৎসবের ন্যায় পালন করা ধর্মীয় বিধি-বিধানের প্রতি অবজ্ঞারই শামিল। ইসলামের সাম্য-মৈত্রী ভ্রাতৃত্বের মূল দাবি উপলব্ধি করে যথাযথভাবে ঈদের উৎসব পালন করতে হবে। এ ক্ষেত্রে বিত্তবানদের উপলব্ধি করতে হবে, সমাজের যারা সহায় সম্বলহীন তাদেরকে তাদের ন্যায্য হিস্সা তথা ধনীদের সম্পদের একাংশ যাকাত-ফিতরা তাদের মধ্যে বিতরণ করতে হবে। যাতে তারাও ঈদের আনন্দ উপভোগের শামিল হতে পারে। কেননা ইসলামী জীবনের মর্মার্থ হলো মানব জীবনে যাতে বিত্তবান ও বিত্তহীনদের মধ্যে আকাশ পাতাল বৈষম্য না থাকে সেদিকে নজর রাখা। আর খাওয়া দাওয়ার আয়োজনে থাকবেনা বাহুল্য অপচয় আর পোশাক আশাকে থাকবে না বিজাতীয় ভাবধারার ছায়া। রোজা ও ঈদুল ফিতর বারবার আসে আমাদেরকে আত্মসচেতন করতে। মুমিনদের প্রত্যয়দীপ্ত অন্তরকে উদ্দীপ্ত করতে। কাজেই আমাদের প্রত্যেকেরই উচিত রোযা ও ঈদুল ফিতরের তাৎপর্য তাসাউফ এর ভাবধারায় উপলব্ধি করে যথাযথ বিধি-বিধান মত দিনটিকে উদ্‌যাপন করা। তবেই দিনটি উদ্‌যাপন করা ফলপ্রসূ হবে। আমিন বেহুরমতে সাইয়্যিদিল মুরছালীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা।

মাহে শাওয়াল এর তাৎপর্য ও সদকাতুল ফিতর

• সৈয়দ আবু আহমদ •

মহান আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে এরশাদ করেন :

"ওয়ালী তুক্‌মিলুল্ ই'দ্দাতা ওয়ালিতুকাব্বিরুল্লাহা আ'লা মা হাদাকুম লাআ'ল্লাকুম তাশ্‌কুরুন"

অর্থাৎ-'আর তোমরা যেন (রোযার) সংখ্যা পূরণ করো এবং আল্লাহর মাহাত্ম্য বর্ণনা করো, এ কারণে যে তিনি তোমাদের হেদায়ত দিয়েছেন। আর তোমরা যেন কৃতজ্ঞ হতে পারো'। (সূরা বাকারা-১৮)

মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী (রহঃ) উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন- ' এ থেকে ঈদের খুশীতে ওই দিন ঈদের নামাযের পূর্বে তাকবীর বলা, ইবাদত করা, রমযানের প্রাপ্তির জন্য খুশী উদযাপন করা সবকিছুই প্রমাণিত হল। কিন্তু এ খুশী রমযান চলে যাবার জন্য নয়, বরং রমযানে সৎকর্ম অর্জন করতে পারার কারণেই। (তাফসীরে নুরুল ইরফান)

হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন-" **যখন ক্বদরের রাত আসে, তখন জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম ফেরেশতাদের বিশাল জামাতসহকারে অবতীর্ণ হন। আর প্রত্যেক বসা বা দাঁড়ানো ওই ব্যক্তিকে বিশেষ দুআ করেন, যিনি আল্লাহর স্মরণে থাকেন। আর যখন ঈদের দিন আসে অর্থাৎ যেদিন আল্লাহ তায়ালা তাঁর এসব নেক বান্দাদের নিয়ে ফেরেশতাদের সাথে গর্ব করেন, সেদিন তিনি বলবেন, 'হে আমার ফেরেশতাগণ, ওই মজদুরের পারিশ্রমিক কী হওয়া চাই, যে তার কাজ পূর্ণভাবে সমাধা করে? ফেরেশতারা বলবেন, হে পালনকর্তা, তার প্রতিদানও পরিপূর্ণ হওয়া চাই'। তখন আল্লাহ তায়ালা বলবেন, 'হে আমার ফেরেশতাগণ, আমার এ বান্দারা তাদের উপর অর্পিত কর্তব্য পূর্ণ করেছে, আবার সরবে প্রার্থনার জন্য ছুটে বেরিয়েছে, আমার ইযযতের কসম, আমার পরাক্রমের শপথ, আমার বদান্যতার শপথ, আমার মহিমার শপথ, আমার উচ্চ মর্যাদার শপথ, আমি অবশ্যই তাদের প্রার্থনায় সাড়া দেবো। অতঃপর (বান্দাদের উদ্দেশে) তিনি ইরশাদ করবেন, তোমরা (ঘরে) ফিরে যাও, আমি তোমাদের ক্ষমা করে দিলাম। তোমাদের পাপগুলো পুণ্যে পরিবর্তিত করে দিলাম, প্রিয় নবী বলেন, তখন তারা ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়ে ঘরে ফিরে যাবে"**। (শুআ'বুল ঈমান ও বায়হাক্বী)

মনে রাখতে হবে ঈদ মুসলমানদের ধর্মীয় উৎসব। কাজেই এ আনন্দ মুক্তির নয়, কৃতজ্ঞতার। মাহে রমযানের সিয়াম, সাধনা যদি আল্লাহর দরবারে কবুল হয়ে থাকে, তবেই ঈদের আনন্দের সার্থকতা।

হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদীনা মুনাওয়ারায় হিজরত করে তাশরীফ আনলেন, তখন সে সময় মদীনাবাসীরা বছরে দুটি দিন জাহেলী যুগের আনন্দ-উৎসব পালন করতো। দিন দুটো ছিল মেহেরগান ও নওরোজ। প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলে মদীনাবাসীরা উত্তরে বললেন, জাহেলী যুগ থেকে এ দিন দুটিতে আমরা আনন্দ করে আসছি। তখন আল্লাহর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, আল্লাহ তায়ালা এ দুটি দিনের পরিবর্তে তোমাদের জন্য উত্তম দুটি দিন দান করেছেন, এক. ঈদুল ফিতর দুই. ঈদুল আযহা। (আবু দাউদ শরীফ, পৃষ্ঠা-১৬১)

ঈদ কার জন্য ?

ঈদ ওই সৌভাগ্যবান মুসলমানদের জন্যই, যারা সম্মানিত রমযানকে রোযা, নামায ও অন্যান্য ইবাদত দ্বারা অতিবাহিত করেছে। এ ঈদ তাদের জন্য আল্লাহর তরফ থেকে পারিশ্রমিক (প্রতিদান) পাওয়ার দিন। আমাদেরতো আল্লাহকে ভয় করা চাই। যেমনিভাবে সায়্যিদুনা হযরত উমর ফারুক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ঈদ পালন করেছেন, **"ঈদের দিন লোকেরা খলীফা উমরের ঘরে হাযির হলেন। দেখলেন, হযরত উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু দরজা বন্ধ করে অঝোরে কাঁদছেন। লোকেরা হতভম্ব হয়ে আরয করলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! আজতো ঈদ, যা খুশী উদযাপনের দিন। খুশীর স্থলে এ কান্নাকাটি কেন করছেন? তিনি চোখের পানি মুছতে মুছতে বললেন, 'হে লোকেরা! এটা ঈদের দিনও, আবার আযাবের হুমকির দিনও। আজ যার রোযা-নামায কবুল হয়েছে, নিঃসন্দেহে আজ তার জন্য ঈদের দিন। কিন্তু যার রোযা, নামায কবুল না করে তার মুখে ছুঁড়ে মারা হয়েছে, তার জন্য আজ আযাবের হুমকির দিন। তাই আমি এ ভয়ে কাঁদছি যে, আহা! আমি জানিনা আমি কি গ্রহণযোগ্যদের**

অন্তর্ভূক্ত, না প্রত্যাখ্যাতদের অন্তর্ভূক্ত"।

শরীয়তে ঐ আনন্দই বৈধ রাখা হয়েছে, যা মানুষকে পূণ্য চেতনায় উদ্ভাসিত করে। আর যা খোদা বিমুখ করে, ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের অনিষ্ট ও অকল্যাণ সাধন করে তা বৈধ নয়।

সদকাতুল ফিতর ওয়াজিব : হাদীস শরীফে আছে- **"প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে নির্দেশ দিলেন যেন মক্কায়ে মুআ'জ্জমার অলিগলিতে এ ঘোষণা দেয়, সদকাতুল ফিতর আদায় করা ওয়াজিব"**। (তিরমিযী,হাদীস নং-৬৭৪,২য় খন্ড)

প্রত্যেক অর্থবান-স্বচ্ছল তথা শরীয়ত নির্ধারিত ধন-সম্পদের অধিকারী মুসলমানদের এই ফিতরা আদায় করতে হবে। এই ফিতরা ঈদের নামাযের পূর্বে আদায় করা মুস্তাহাব। ফিতরা হলো জন প্রতি ২ কেজি ৫০ গ্রাম পরিমাণ গম বা সমমূল্য অথবা যব বা সমমূল্য। (রদ্দুল মুহতার, ও আলমগীর)

সদকায়ে ফিতরের হকদার হচ্ছে- **"যারা যাকাতের হকদার অর্থাৎ যাদেরকে যাকাত দেয়া যায়, তাদেরকে ফিতরাও দেয়া যায়"**। (দুররুল মুখতার ও রদ্দুল মুহতার)

হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন-**'যতক্ষণ পর্যন্ত সদকায়ে ফিতর আদায় করা হয় না, ততক্ষণ পর্যন্ত বান্দার রোযা যমীন ও আসমানের মাঝখানে ঝুলন্ত থাকে'**। (কানযুল ওম্মাল, ৮ম খন্ড,হাদীস নং-২৪১২৪ ও দায়লামী)

হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, **"রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদুল ফিতরের দিন কয়েকটা খেজুর না খেয়ে ঈদের নামাযে তাশরীফ নিয়ে যেতেন না আর খেজুরের সংখ্যা বিজোড় হতো"**। (বুখারী শরীফ, ১ম খন্ড, হাদীস নং-৯৫৩ ও তিরমিযী,২য় খন্ড, হাদীস নং-৫৪২)

শাওয়াল মাসে আমলীয় বিষয় : ঈদুল ফিতর এর রাত স্বীয় বান্দাদের জন্য আল্লাহর বিশেষ দান বা অনুগ্রহের পাঁচ রাতের একটি। আল্লাহ পাক পাঁচটি রাতে বান্দার দোয়াকে কবুল করেন। এই পাঁচটি রাত হল-(১) জুমআর রাত। সপ্তাহের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাত। এ রাতে দোয়া করলে আল্লাহ কবুল করেন। হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) এর বর্ণিত) হাদীসে আছে-"জুমআর দিন হলো আলোকিত, আর জুমআর রাত হলো আলোক উদ্ভাসিত। (২) ও (৩) হলো দুই ঈদের রাত, যথা : ঈদুল ফিতরের রাত ও ঈদুল আযহার রাত। যে দিনদ্বয়ে ঈদ হবে তার আগের রাত। আল্লাহ পাক এই রাতগুলোতে বান্দার দোয়াকে কবুল করেন। (৪) মহিমান্বিত রাত হলো রজব মাসের চাঁদ উদয়ের প্রথম রাত। এ রাতে আল্লাহ বান্দার দোয়া কবুল করেন। (৫) মাহে শা'বানের ১৪ তারিখ দিবাগত রাত। এ রাতেও আল্লাহ মানুষের দোয়া কবুল করেন"। (সুনানে বায়হাকী ৩/৩১৯)

শাওয়াল মাসের মধ্যে ছয়টি নফল রোযা'র গুরুত্ব অপরিসীম। ঈদের দিন ব্যতীত পূরা শাওয়াল মাসে যেকোন দিন একসাথে বা আলাদাভাবে ছয়টি রোযা রাখতে পারবে। তবে একসাথে রাখতে পারলে ভাল। (বাহারে শরীয়ত, ৫ম খন্ড, পৃষ্ঠা-১৪০)

শাওয়ালের নফল রোযা'র অনেক ফজিলত: পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন- **"রোযা পালনকারী পুরুষ ও নারীগণ, স্বীয় লজ্জাস্থানের পবিত্রতা হিফাযতকারী পুরুষ ও নারীগণ এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও নারীগণ এর জন্য আল্লাহ ক্ষমা ও মহা প্রতিদান তৈরী করে রেখেছেন"**। (সূরা আহযাব,আয়াত নং-৩৫)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-" **যে ব্যক্তি রমযানের রোযা পালনের পর, শাওয়াল মাসে ছয়টি রোযা রাখবে, সে ব্যক্তি যেন সারা বছরই রোযা রাখল"**। (মুসলিম শরীফ, পৃষ্ঠা-৫৯২, হাদীস নং-১১৬৪ ও সুনানে ইবনে মাযাহ, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা-৩৩৩, হাদীস নং-১৭১৫)

অন্যদিকে বলেন-" **আল্লাহ তায়ালা তাকে দোযখ থেকে ৪০ বছরের দূরত্বে রাখবেন"**। (কানযুল উম্মাল,৮ম খন্ড, হাদীস নং-২৪১৪৮)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- " **যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য একটি রোযা রাখে আল্লাহ তাকে জাহান্নাম থেকে এতটুকু দূরে সরিয়ে রাখেন যে, একটি কাক শিশুকাল থেকে বৃদ্ধ হয়ে মৃত্যু পর্যন্ত সর্বদা উড়তে উড়তে যতদূর যেতে পারবে,ততদূর"**। (মুসনাদে আহমদ,৩ খন্ড,পৃষ্ঠা-৬১৯)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন-" **রোযা রাখো, কেননা এর মত উত্তম অন্য কোন আমল নেই"**। (নাসায়ী শরীফ, ৪ খন্ড, পৃষ্ঠা-১৬৬)

এভাবে শাওয়ালের রোযা ও নফল রোযার অসংখ্য ফজিলত কুরআন ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে।

পরিশেষে আবারো বলি আত্মশুদ্ধি ও সংযম সাধনার পর বিশ্ব

মুসলিমের দ্বারে খুশির বার্তা নিয়ে এসেছে ঈদুল ফিতর। এ নির্মল আনন্দের বিধান এসেছে মহান আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে তাঁর প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মাধ্যমে। তাই এক ভিন্ন উপলব্ধিতে আত্মিক পরিশুদ্ধতা সহকারে এ ঈদ উদ্‌যাপন করে মুসলমানরা। রমযানে চিত্তশুদ্ধির চর্চা হয়, সুপ্রবৃত্তির বিকাশ ঘটে ও সৎ গুণাবলীর সন্নিবেশ হয়। তাক্বওয়ার গুণাবলী অর্জন ও চারিত্রিক উৎকর্ষ সাধনের প্রশিক্ষণ শেষে এ আনন্দ উৎসব পরবর্তী সময়ের শুদ্ধ জীবনাচারে উদ্দীপ্ত করে। বিকশিত করে মানবিকতা। তবে ঈদের প্রকৃত অনাবিল আনন্দ তাদের জন্যই যারা দিনে পানাহার বর্জন করেছে, নিষিদ্ধ কার্যাবলী থেকে রিপু দমন করেছে, রোযার আহকামগুলো নিষ্ঠার সাথে পালন করেছে, দুস্থ, এতিম অসহায়দের মুখে হাসি ফুটাতে সক্ষম হয়েছে এবং তাক্বওয়ার গুণাবলী অর্জনের মাধ্যমে নিজেকে পরিচালিত করেছে। পক্ষান্তরে যারা রোযা পালন করেনি, রমযানের পবিত্রতাকে অবমাননা করেছে, আল্লাহর বিধান এর প্রতি অবাধ্য হয়েছে তাদের জন্য দুঃসংবাদ।

তাইতো আল্লাহ তায়ালা বলেন– **"ফালইয়াদ্বহাকো ক্বলিলাওঁ ওয়াল ইয়াবকো কাছিরা জাযাআম্ বিমা কানো ইয়াকসিবুন"** অর্থাৎ-' অতএব তারা অল্প হেসে নিক এবং তারা নিজ কৃতকর্মের বদলায় প্রচুর কাঁদবে'। (সূরা তাওবা, ৮২ নং আয়াত)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে, **'দুনিয়ার অবস্থান অতি অল্প, এতে ওরা যা ইচ্ছে হেসে নিতে পারে। অতঃপর দুনিয়া শেষ হয়ে যখন আল্লাহর সমীপে উপস্থিত হবে, তখন শুধু কান্নার পালাই শুরু হবে, যা আর নিবৃত্ত হবে না'**। (তাফসীরে মাযহারী)

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন-" **রমযানের যাবতীয় কর্মসূচি যে পালন করেছে ঈদের আনন্দ তার জন্য, আর যে রমযানের আদর্শ ও হুকুম উপেক্ষা করে হাসি তামাশা করেছে তার জন্য ঈদ অগ্নিশিখা তুল্য"**

উপসংহার : শেষপ্রান্তে এসে শুধু কুরআনের ভাষায় বলতে হয়, আল্লাহ তায়ালা বলেন– **" মা আতাকুমুর রাসূলা ফাখুযুহু ওয়ামা নাহাকুম্ আ'নহু ফান্তাহু"** অর্থাৎ-' তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূল যা নিয়ে এসেছেন বা দেন, তোমরা তাই গ্রহণ করো, আর যা থেকে তিনি নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাক'। (সূরা হাশর, ৭ নং আয়াত)

তাইতো গাউসুল আ'যম হযরত মাওলানা সৈয়দ আহমদুল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী (ক.) যথার্থই বলেছেন, **"আমার ছেলেরা সারা বছরই রোযা পালন করে থাকে"**। (সুবহানাল্লাহ্) এ কথার মহাত্ম্য হচ্ছে পবিত্র রমযানের শিক্ষা নিয়ে সারা বছরই তা ধারণ করে চলতে হবে, অন্যথায় রমযানে শুধু উপবাস থাকার মত হবে। অন্যদিকে তাঁরই যোগ্য উত্তরসূরী বিশ্বঅলি শাহানশাহ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) এর অমীয় বাণী হচ্ছে– **" তোমরা হালাল খাও, নামায পড় এবং আল্লাহু আল্লাহু জিকির কর, সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে"**। (সুবহানাল্লাহ্) প্রকৃত পক্ষে সারা বছর তাই হওয়া উচিত। "ওয়ামা তাওফিক্বি ইল্লা বিল্লাহ্"

শাওয়াল মাসে যে সমস্ত মনীষীদের ফাতেহা শরীফ :

১। হযরত ইমাম জাফর সাদেক (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) ১৫ শাওয়াল।

২। হযরত ইমাম বোখারী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) ১ শাওয়াল।

৩। হযরত আবু দাউদ (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) ১৬ শাওয়াল।

৪। হযরত খাজা ওসমান হারুনী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) ৬ শাওয়াল।

৫। হযরত বদর শাহ আউলিয়া (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) ১ শাওয়াল।

একটি ঘোষণা

আগামী ৭ আগস্ট ২০১৪ বৃহস্পতিবার বাদে এশা বিশ্বঅলি শাহানশাহ্ হযরত জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) এর ২৬ তম উরস শরীফ এর প্রস্তুতি সভা গাউসিয়া হক মনজিল সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হবে। এতে সকলকে উপস্থিত থাকার অনুরোধ জানানো হয়েছে।

রমজান শেষে আনন্দের অধিকার ও অনুতাপের ভয়

• মুহাম্মদ ওহীদুল আলম •

পৃথিবীর ১৬০ কোটি মুসলমানদের মত বাংলাদেশের মুসলমানরাও দীর্ঘ একমাস ধরে রোজা পালন করেছেন। রোজা সবচেয়ে গোপন ইবাদত। ইবাদত করা হয় একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। আল্লাহর আদেশ নিষেধ মেনে চলাই ইবাদত। আল্লাহ যা আদেশ করেছেন সেসব পালন করা আর যা নিষেধ করেছেন সে সব হতে বিরত থাকাই ইবাদত। ইবাদতে নিয়তের শুদ্ধতা ও আচরণের সরলতা অপরিহার্য। তবে মানবীয় দুর্বলতার কারণে কোন কোন মানুষের মধ্যে প্রদর্শনীবাতিক থাকতে পারে। ইবাদতে কিন্তু প্রদর্শনীবাতিকের কোন ঠাঁই নেই। লোক দেখানো কোন ইবাদত ইবাদতই নয়। তন্মধ্যে রোজা এমন একটি গোপন ইবাদত যাতে লোকদেখানো ভাব প্রকাশের কোন সুযোগ নেই। তাই এ ইবাদত আল্লাহর কাছে খুবই পছন্দনীয়। আল্লাহ সবচেয়ে গোপন। আল্লাহ হচ্ছেন গোপনীয়দের মধ্যে গোপনতম। মানুষ যখন আত্ম সংশোধনের সাধনায় গোপনে অনুশীলন করে তখন তা আল্লাহর গোপন বৈশিষ্ট্যের অনুগামী হয়। এজন্য রোজার পুরস্কার আল্লাহপাক নিজ কুদরতী হাতে দেবেন। কী পুরস্কার দেবেন কিংবা কী পরিমাণ দেবেন তার অনুমান করা মানুষের সাধ্যের বাইরে। পৃথিবীতে দেখা যায়, যে মানুষ যত বেশি সম্পদশালী ও উদার, অভাবগ্রস্ত ও নিঃস্ব মানুষের প্রতি বদান্যতায় সে ততবেশি অগ্রগামী। আল্লাহ এমন এক সত্তা যাঁর সম্পদ অফুরন্ত ও রহমত সীমাহীন। তাই বান্দাদের প্রতি তাঁর দানও হবে স্বাভাবিকভাবে তুলনাবিহীন।

মহান আল্লাহ তায়ালার এ তুলনাবিহীন রহমত ও পুরস্কার পেতে হলে মানুষকেও হতে হবে সর্বক্ষেত্রে আন্তরিক ও আগ্রহী। এর জন্য প্রয়োজনীয় সাধনা ও অনুশীলন খুবই জরুরী। রোজা শুধু দিনের বেলা পানাহার ও বৈধ যৌনসম্ভোগ থেকে বিরত থাকার নাম নয়। সকল প্রকার ভোগবাদিতা, অসংযম, অনাচার, অশ্লীলতা, পরচর্চা, পরনিন্দা, মিথ্যা ও হারাম কাজ বর্জন করাই রোজার শিক্ষা। আমরা রোজার দিনে "হালাল" খাবার গ্রহণ হতে বিরত থাকি ও অন্য সময়ে অনুমতি দেয়া আছে এমন কাজও পরিহার করি। যাতে রমযান পরবর্তী সময়গুলোতে আমরা হারাম কাজগুলো বর্জন করে চলতে পারি। আল্লাহর পবিত্র দরবারে পবিত্র ও নির্ভেজাল আমলই গৃহীত হয়। এ ধরণের নির্ভেজাল ইবাদতের জন্য হালাল রুজি শর্ত। আল্লাহ মানুষের রিজিক অর্জনের জন্য দুনিয়ার জমিনকে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। যে সমস্ত বস্তু মানুষের অভাব পূরণের জন্য দরকার তার সব কিছু আল্লাহ প্রকৃতির মধ্যে মজুত রেখেছেন। মানুষ এসবের রূপান্তর ঘটিয়ে উপযোগিতা সৃষ্টি করে ও আপন প্রয়োজন মেটায়। মানুষ দু'ভাবে নিজের প্রয়োজন মেটাতে পারে। একটা হালাল উপায়ে অন্যটি হারাম উপায়ে। কিন্তু যে কোন উপায়ে হোক সে পৃথিবীতে তার নির্ধারিত অংশই পাবে। বাতিল পন্থায় যে কোন উপার্জনই হারাম। পবিত্র কুরআন শরীফে আল্লাহ 'বাতিল'- এই একটি মাত্র শব্দ ব্যবহার করে মানুষের জন্য হালাল উপায় ছাড়া রোজগারের অন্যসব উপায়কে নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন।

অর্থনীতি শাস্ত্র অনুযায়ী মানুষের সাধারণ কর্মকান্ড আয় ও ব্যয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ। মানুষ অর্থ উপার্জন করে ও উপার্জিত অর্থ ব্যয় করে নিজের অভাব পূরণ করে। এটাই তার 'অর্ডিনারি বিজনেস অব লাইফ'। কিন্তু একজন আত্মমর্যাদাশীল মানুষ কখনো যেনতেন প্রকারে জীবন যাপন করেনা। যেনতেন প্রকারে সে উপার্জন ও ব্যয় করে না। এখানেই গড় মানুষ ও বিশিষ্ট মানুষের মধ্যে পার্থক্য। রোজা আমাদেরকে বিশিষ্ট মানুষ হতে বলে। কুরআনের ভাষায় রোজার উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের মাঝে তাকওয়া সৃষ্টি করা। তাকওয়া এমন এক গুণ যা মানুষকে আল্লাহমুখী করে। অসংখ্য কন্টকাকীর্ণ পথে চলতে গিয়ে যেমন অতি সাবধানে পা ফেলতে হয় তেমনি বিশিষ্ট বিবেচনার পথ হচ্ছে তাকওয়ার পথ। এ পথ অবলম্বনকারীদের সন্দেহজনক যে কোন বস্তু, কাজ থেকে বিরত থাকতে হয়। এ পথে চলতে গেলে নিজেকে কোনভাবে কলুষিত করার সুযোগ নেই।

একজন রোজাদার মানুষ অবশ্যই শুচি-শুদ্ধ মানুষ। সে শুধু মসজিদে কিংবা প্রার্থনাগৃহে শুচিশুদ্ধ নয়, সমাজেও তাকে শুচিশুদ্ধ হতে হয়। ইবাদতে আন্তরিক অথচ সমাজ জীবনে মুনাফিক এমন রোজাদার মানুষ 'সোনার পাথর বাটি'র মত অকল্পনীয় ও অগ্রাহ্য। যে ব্যবসায়ী মানুষ রোজাদার ও নামাযী অথচ সে যদি তার ব্যবসায় কারসাজি করে মূল্যবৃদ্ধি করে, পণ্যে ভেজাল মেশায়, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি করার মানসে পণ্যমজুদ করে রাখে, বাজারে পণ্য সরবরাহে বিঘ্ন ঘটায়, মানুষের দুর্বলতাকে পুঁজি করে পণ্যের মূল্য বাড়ায় তাহলে

বুঝতে হবে তার রোজা পালন ও নামায আদায় তার কোন উপকারে আসেনি। যদি সে মনেও করে যে, ব্যবসায়ে অসাধুতা অবলম্বন করলেও তার নামায রোজা তাকে ব্যক্তিগতভাবে উপকৃত করেছে তবুও বলতে হবে সমাজের মানুষ তার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্তই হয়েছে। যে মানুষ সমাজে অন্য মানুষের ক্ষতির কারণ ঘটায় সে নিজেকে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করতে পারে না।

একইভাবে একজন বড় আমলা বা পদস্থ সরকারী বেসরকারী কর্মচারী যদি রোজাদার ও নামাযী হয় অথচ অবস্থানগত সুবিধার কারণে বা প্রশাসনিক ক্ষমতার জোরে দেশের সাধারণ নাগরিককে হয়রানী করে বাতিল পন্থায় অন্যায় সুযোগ গ্রহণ করে নিজের 'আখের' গোছাতে চায় প্রকৃতপক্ষে সে নিজের আখিরাতকেই ধ্বংস করে দেয়।

আমাদের দেশে যারা 'কর্তৃপক্ষ' নামে অভিহিত তারা সবসময় একটা অবস্থানগত সুবিধা ও একপ্রকার 'নিরাপত্তা বোধে' নিশ্চিত থাকেন। ফলে তাদের মধ্যে কর্তৃত্বপরায়নতার পাশাপাশি একটা ড্যামকেয়ার ভাব নদীর স্রোতের মত জারি থাকে। যার মধ্যে কর্তৃত্বপরায়নতার ভাব বেশি তার মাঝে সেবাপরায়নতার অভাব ততবেশি প্রকট। যে কোন 'ক্রাইসিস'কে নিজের 'ফেভারে' ব্যবহার করতে সে সিদ্ধহস্ত। আমরা যদি কোন অফিসে কোন চেয়ার টেবিলের অধিকারী হই তাহলে যে লোক আমাদের সামনে এসে উপস্থিত হয়, আমরা তাকে নিজেদের চেয়ে নিকৃষ্ট ভাবতে ভালবাসি। এমন ক্ষমতাশালী মানুষ (কর্তৃপক্ষ) যদি রোজাদার ও নামাযী হয় আর তার মাঝে যদি আচরণগত পার্থক্য পরিলক্ষিত না হয় তাহলে বুঝতে হবে রোজা ও নামায তাকে কোন সুপথ দেখাতে পারেনি। হয়তো তার রোজা হয়েছে শুধুমাত্র উপবাস যাপন এবং নামায হয়েছে উঠা বসার কসরত করার নামান্তর।

আমাদের দেশে প্রতি বছর রোজা এলে দেখা যায় জিনিষপত্রের দাম ব্যাপকভাবে বেড়ে যায়। শুধু রোজার শুরুতে নয়, পণ্যের এ দাম বাড়তে থাকে শবে মেরাজের সময় থেকে। শবে বরাত এলে দ্রব্যমূল্য আরেক ধাপ বেড়ে যায়। আর রমজান এলে তা হয়ে পড়ে একেবারেই লাগামহীন। প্রতিবছরই রমজান আসার আগে দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রাখার জন্য জনসাধারণের কাছ থেকে জোরালো দাবি জানানো হয়। ব্যবসায়ীরা দ্রব্যমূল্য না বাড়ানোর প্রতিশ্রুতি দেন। সরকার বলেন পণ্যমূল্য স্থিতিশীল রাখার জন্য তারা সর্বাত্মক ব্যবস্থা নেবেন, নিয়েছেন ও নিচ্ছেন। সংবাদ পত্রের সম্পাদকীয়, উপসম্পাদকীয় ও চিঠিপত্র কলামে এই একটিমাত্র বিষয়ে প্রচুর লেখার মাধ্যমে নানা প্রত্যাশা ও আকুতি ব্যক্ত করা হয়। কিন্তু কার্যত দেখা যায়, সকল আশ্বাস, প্রতিশ্রুতি, প্রত্যাশা ও আকুতিকে অগ্রাহ্য করে প্রতিবছরই দ্রব্যমূল্য হয়ে পড়ে লাগামহীন। আর সাধারণ মানুষের উঠে নাভিশ্বাস। নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত, সীমিত ও স্বল্প আয়ের মানুষের দুর্দশার কোন সীমা থাকেনা। আর এ বছর রমজানের আগেভাগে এসেছিল বাজেট প্রনয়নের মাস। বাংলাদেশে বাজেট মানেই দ্রব্যমূল্যের আর এক দফা মূল্যবৃদ্ধি। প্রতিবছর বাজেট ঘোষণার পরপর কোন কোন দ্রব্যের মূল্য কমবে ও কোন কোন দ্রব্যের মূল্য বাড়বে তার একটা তালিকা প্রকাশিত হয়। তবে বাড়তি তালিকার মূল্যতো বাড়েই, যে সকল দ্রব্যের মূল্য কমবে বলে প্রচার করা হয় তা কিন্তু কমেনা। পাইকারি বাজারে তা যদি কমেও খুচরা বাজারে এর কোন প্রতিফলন ঘটে না। পত্রিকায় দেখেছি এ বছর ১০ থেকে ১২ জন আমদানীকারক ও মজুদদার দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ করেছেন। আর সারা দেশে ৩৮ জন ব্যবসায়ী দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ করে থাকেন। এদের সহযোগী থাকেন সরকারী দলের ক্ষমতাধর রাজনীতিক ও প্রশাসনিক ব্যক্তিবর্গ। ১৬ কোটি মানুষের দেশে ক্ষুদ্রতম একটি গোষ্ঠী যদি এতই দাপটশালী হয় তাহলে সে দেশে সাধারণ মানুষের জীবনচালচিত্র করুণতম হতে বাধ্য। সারা বছর কষ্টেসৃষ্টে মানুষ যা সঞ্চয় করে এক রমজানে দ্রব্যমূল্যের ধাক্কায় তা নিঃশেষ হয়ে যায়। গুটিকয় ধনী আরো ধনী হয়। আর সাধারণ মানুষ নেমে যেতে থাকে দারিদ্রসীমার নীচে।

আমাদের দেশে দ্রব্যমূল্য বাড়ার পেছনে আর একটা বড় কারণ হল পথে পথে চাঁদাবাজি। পণ্যপরিবাহী ব্যবসায়ীদের উত্তরবঙ্গ থেকে রাজধানী বা অন্যান্য জেলা শহরে আসতে পথে পথে কমপক্ষে ১২টি যায়গায় চাঁদাবাজির শিকার হতে হয়। কারা এ চাঁদাবাজ তা সরকার যেমন জানে জনসাধারণও তাদের তেমন চেনে। উৎপাদনের সাথে একবারে সম্পর্কহীন এ লুটেরা শ্রেণীর বিরুদ্ধে আইনগত ও যথাযথ ব্যবস্থা নেয়ার গরজ কেউ অনুভব করে না। সরকার এ ব্যাপারে বেদনাদায়কভাবে উদাসীন। আইনশৃংখলা বাহিনীর সদস্যরাই চাঁদাবাজদের দোসর। কারণ তাদেরকে ম্যানেজ না করে চাঁদাবাজরা তাদের 'কাজ' নির্বিঘ্নে সারতে পারে না। ক্ষেত্রবিশেষে পুলিশও এ চাঁদাবাজির অংশীদার। যেহেতু এ চাঁদার অংশ 'যোগ্যতামত' সব যায়গায় ভাগবাটোয়ারা হয় সে জন্য ঘটনার কোন ইতর বিশেষ হয় না।

দ্রব্যমূল্য বাড়ার পেছনে ভোগবাদী ক্রেতার অবিবেচনাপ্রসূত কর্মকান্ডও অনেকাংশে দায়ী। কিছু কিছু ক্রেতার ধারণা বুঝি বাজার থেকে জিনিষপত্র উধাও হবে যাবে। তারা একসাথে প্রয়োজনাতিরিক্ত জিনিষপত্র কিনতে তৎপর হয়ে উঠে। যেখানে এক কেজি জিনিষ হলে চলে সেখানে তারা কেনে ৫ কেজি। ভেবে দেখুন সারা দেশে তিন কোটি পরিবার যদি এক সাথে ৫ কেজি করে সয়াবিন তেল কেনে তাহলে একসাথে ১৫ কোটি লিটার সয়াবিন তেল ঘরেই মজুত হয়ে যায়। তারা যদি ৫ কেজির পরিবর্তে ১ কেজি করে কিনত তাহলে বাজারে ১০ কোটি লিটার সরবরাহ বেশি থাকত। এজন্য বলা হয়ে থাকে অপেক্ষাকৃত গরীবরাই বিত্তশালীদের আরো বিত্তশালী করে দেয়। কারণ ধনীদের সম্পদ বৃদ্ধির পেছনে জনসাধারণের অহেতুক ভোগস্পৃহাই দায়ি।

রমজান আসে মানুষের এ ভোগবাদিতাকে যৌক্তিক সীমারেখার মধ্যে নামিয়ে আনার জন্য। জীবনাচারে সংযমী হওয়ার জন্য। কিন্তু অনেক মানুষের কাছে রমজান হয়ে পড়েছে ভোগের বাড়তি আয়োজনের মৌসুম। ঈমানদার মানুষের জন্য রমজান পূণ্য অর্জনের মাস। আর কারো কারো কাছে এটা হচ্ছে পণ্যের মাস। হয় পণ্যের (মজুত ও বিক্রির) মাধ্যমে বাড়তি উপার্জন না হয় পণ্য ভোগের মাধ্যমে বাড়তি তৃপ্তি লাভ।

অথচ রমজান এলে মসজিদে মুসল্লির ভীড় বেড়ে যায়। টুপি তসবিহর দোকানে ক্রেতার ভীড় বেড়ে যায়। সাধারণ মানুষের প্রতি সহমর্মিতা বেড়ে যায়। দীনদুঃখীদের অভাব মোচনে বিত্তবানরা এগিয়ে আসে। দান খয়রাত বাড়ে। যাকাত ফিতরা আদায় করা হয়। কিন্তু সমাজের বা মানুষের গুণগত কোন পরিবর্তন হয় না। আমাদের দেশে যে সমস্ত ভালো ও সৎ মানুষ আছেন তাঁদের সৎকর্মের কোন প্রতিফলন সমাজ জীবনে অনুভূত হয় না।

অবশ্যই রমজান ছিল তাকওয়া অর্জনের মাস। আল্লাহর রহমত, বরকত ও দোযখের আগুন থেকে নাযাত লাভের মাস। সিয়াম সাধনার মাধ্যমে আমরা যদি আল্লাহর এসব নিয়ামত অর্জনে সক্ষম হই তাহলে আমরা অবশ্যই মহা সৌভাগ্যবান। আর যদি তা লাভে ব্যর্থ হই তাহলে অবশ্যই রমজান আমাদের জন্য অনুশোচনার মাস।

রমজানের কঠোর সাধনার পর ঈদের আনন্দ বার্তা নিয়ে আসে শাওয়াল মাস। পরিশ্রম শেষে যেমন শ্রমিকের পাওনা মিটিয়ে দেয়া হয় তেমনি আল্লাহ তাঁর নেককার বান্দাদের রমযান মাসব্যাপী কষ্ট ও সাধনার পূণ্যফল শাওয়ালের প্রথম দিনেই দিয়ে দেন। তাই এদিন আমাদের জন্য খুবই আনন্দের দিন। এখন আমাদের কর্মকান্ডের নিরিখে আমাদের ভেবে দেখতে হবে আমরা রমযান শেষে সত্যিকারের আনন্দের হকদার হয়েছি নাকি অর্জন করেছি অনুতাপের আগুনে দগ্ধ হওয়ার যোগ্যতা।

***

পাদটীকা:

আমরা এ বছর (১৪৩৫ হিজরী) এমন এক সময় ঈদুল ফিতর পালন করছি যখন বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের সংখ্যালঘু মুসলমান ও বিশেষ করে ফিলিস্তিনি মুসলমানরা ব্যাপক সহিংসতা, নির্মম অত্যাচার, নৃশংস নিপীড়ন ও ধ্বংসযজ্ঞের শিকার। মধ্য আফ্রিকার আদিবাসী ১০ লক্ষ মুসলমান রাষ্ট্রীয় সহায়তায় চরমপন্থী খৃষ্টানদের অত্যাচারে ইতোমধ্যে উৎখাত হয়ে গেছে। মায়ানমারে উগ্রপন্থী বৌদ্ধ ভিক্ষুদের নৃশংসতায় রোহিঙ্গা মুসলমানরা বাস্তুহারা ও দেশ ছাড়া হয়ে পড়েছে। শ্রীলংকাতেও চলছে মুসলিম নিধন। ভারতের আসামে বোড়োদের হামলায় মুসলমানরা অপহৃত হয়ে খুন হয়ে যাচ্ছে। পুনেতে শুধু মুখে দাঁড়ি ও মাথায় টুপি থাকার কারণে আইটি বিশেষজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ার মহসিন শায়েখ ভারতে নতুন গজিয়ে উঠা হিন্দু রাষ্ট্র সেনা নামের সন্ত্রাসীদের হাতে নির্মমভাবে নিহত হয়েছে। ৮ জুন ২০১৪ মুম্বাইয়ের দৈনিক উর্দু টাইমস এ প্রকাশিত সাংবাদিক মুরাদাবাদীর লেখায় এ ঘটনার মর্মস্পর্শী বর্ণনা রয়েছে। চীনের উইঘুরের জিংজিয়াং প্রদেশে মুসলমানদের রোজা রাখা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। নিষেধ অমান্যকরে যারা রোজা রাখছে তাদের উপর করা হচ্ছে নির্মম নির্যাতন। আর গাজাতে ইসরাইলের বর্বরোচিত একতরফা বিমান হামলায় রীতিমত মানবিক বিপর্যয় সৃষ্টি হয়েছে। ৮ জুলাই থেকে আরম্ভ হওয়া এ হামলায় ১৬ জুলাই পর্যন্ত ২১৩ জন ফিলিস্তিনি মুসলমান নিহত হয়েছে। এমন পরিবারও আছে যাদের একজন সদস্যও জীবিত নেই। লক্ষাধিক মানুষ আশ্রয়হীন হয়ে পড়েছে। বিশ্বের শান্তিকামী মানুষ এর প্রতিবাদে সোচ্চার হলেও বিশ্ব নেতৃত্ব, জাতিসংঘ, ওআইসি, আরবলীগ এবং বিশেষ করে মুসলিম দেশ ও সরকারগুলো ফিলিস্তিনিদের মানবিক বিপর্যয় প্রতিরোধে কার্যকর কোন ভূমিকা পালন করতে চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে। এহেন প্রেক্ষাপটে বিশ্বের মুসলমানদের ঈদের আনন্দ ম্লান হতে বাধ্য।

ইসলামে যাকাতের গুরুত্ব এবং দারিদ্র্য বিমোচন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সঠিক যাকাত বন্টন নীতি বাস্তবায়নের রূপরেখা

• ড. মুহম্মদ আবদুল মান্নান চৌধুরী •

পূর্বপ্রকাশিতের পর:

১২. যাকাত থেকে প্রাপ্ত অর্থের ব্যবহার: যাকাতভোগীদের সম্পর্কে পূর্ববর্তী আলোচনা থেকে এটা প্রতীয়মান হয় যে, যাকাত তহবিল থেকে দরিদ্র, অভাবী, দুঃস্থ নারী-পুরুষ, রুগ্ন, অক্ষম, পঙ্গু, বৃদ্ধ, এতিম, বিধবা এবং অনুরূপ অসহায় মানুষের জন্য নিয়মিত ভাতার ব্যবস্থা করা উচিৎ, যাতে তারা জীবনের মৌলিক প্রয়োজন পূরণে সক্ষম হয়। দরিদ্র ও অভাবী জনগোষ্ঠীর সক্ষম অংশকে এমনভাবে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে তারা স্বাবলম্বী হয়ে মানবিক মর্যাদা নিয়ে বাঁচতে পারে। মুসাফিরদের জন্য এমন সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করতে হবে যাতে পথে তাদের কষ্ট না হয়। সংগত কারণে যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে, তাদের ঋণমুক্তির জন্য সাহায্য করা এবং তাদের রুজিরোজগারের এমন ব্যবস্থা করে দেয়া যাতে তারা ঋণ করতে বাধ্য না হয়। ইসলামের প্রচার, প্রসার ও প্রতিষ্ঠার জন্য এমন স্থায়ী প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে যাতে সমাজে ইসলামের ভিত মজবুত হয়। এ জন্য গবেষণা, প্রকাশনা ও প্রশিক্ষণের উন্নততর ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। দরিদ্র ও অভাবী লোকদের সন্তান-সন্ততির উন্নত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের জন্য স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, পাঠাগার ইত্যাদি কায়েম করা যেতে পারে। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর চিকিৎসার লক্ষ্যে দেশের সকল এলাকায় বিনামূল্য চিকিৎসা সুবিধা দানের জন্য হাসপাতাল, ক্লিনিক, ডিসপেন্সারী ইত্যাদি কায়েম করা যেতে পারে। বেকার লোকদের নিয়মিত ভাতা এবং তাদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা যেতে পারে। দরিদ্র মেধাবী ছাত্রদের জন্য স্টাইপেন্ড, স্কলারশীপ এবং অনুরূপ সাহায্যের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। তাছাড়া প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন: বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, ভূমিকম্প প্রভৃতিতে ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের সাহায্য, পুনর্বাসনের ক্ষেত্রেও যাকাত তহবিল বিরাট অবদান রাখতে পারে। যাকাত এমনভাবে দিতে হবে যাতে করে বর্তমান বছরে যে যাকাত গ্রহণ করে, পরবর্তী বছরে সে যেন আর যাকাতভোগী না থাকে। যাকাতের মাধ্যমে তার যেন একটি অব্যাহত সম্পদ ও আয় সৃষ্টি প্রক্রিয়া শুরু হয়। মোট কথা, পরিকল্পিতভাবে যাকাত সংগ্রহ ও ব্যয়-বন্টনের ব্যবস্থা করতে পারলে যে কোন দেশে দারিদ্র্য দূরীকরণ ও দুঃস্থ মানবতার কল্যাণে যাকাত বিরাট ভূমিকা পালন করবে।

১৩. যাকাত সংগ্রহ ও বন্টন ব্যবস্থার ইতিবৃত্ত: হযরত মুহাম্মদ (দ.) আল্লাহর রসূল হিসেবে এবং ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে যাকাতের বিধান জারী করেছেন এবং যাকাত সংগ্রহ ও বন্টনের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গড়ে তুলেছেন। হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত এক হাদীসে জানা যায়, জিমাম ইবনে মালবাতা নবী করিম (দ.) কে জিজ্ঞেস করলেন, "আল্লাহ্ কি নির্দেশ দিয়েছেন যে, আপনি আমাদের মধ্যকার ধনী লোকদের কাছ থেকে যাকাত গ্রহণ করবেন এবং আমাদের মধ্যকার দরিদ্রদের মধ্যে তা বন্টন করবেন?" উত্তরে হযরত রসূলে করিম (দ.) বললেন, "হ্যাঁ" (বুখারী ও মুসলিম)। হযরত মুয়ায বিন জাবাল (রা.) বলেন; তাঁকে ইয়েমেনে পাঠানোর সময় নবী করিম (দ.) তাঁকে বলেছিলেন, "তুমি আহলে কিতাবদের এক জাতির কাছে যাচ্ছ। তুমি তাদের লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ- এ সাক্ষ্য দানের জন্য দাওয়াত দেবে। তারা যদি তা মেনে নেয়, তাহলে তাদের জানাবে যে, আল্লাহ তাদের উপর দিন-রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরয করেছেন। যদি তারা তাও মেনে নেয়, তাহলে তাদের জানাবে আল্লাহ তাদের উপর যাকাত ফরজ করে দিয়েছেন; যা তাদের ধনীদের কাছ থেকে গ্রহণ করা হবে এবং তাদেরই গরিবদের মধ্যে বন্টন করা হবে। তারা একথাও মেনে নিলে তোমাকে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। তাদের ধন-মালের উত্তম অংশ তুমি নেবে না। আর মজলুমদের ফরিয়াদকে অবশ্যই ভয় করবে। কেননা তার ও আল্লাহর মাঝে কোন আড়াল নেই।" প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, নবী করিম (দ.) ইসলামী রাষ্ট্রের বিভিন্ন এলাকায় যাকাত উসুল করার জন্য লোক নিয়োগ করতেন। তাঁরা নিজ নিজ নির্ধারিত এলাকায় ধনীদের নিকট থেকে যাকাত সংগ্রহ করতেন এবং কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ হতে তা রীতিমত বন্টন করা হতো। খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলেও যাকাত আদায়ের এ পদ্ধতি কার্যকর ছিল। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, যাকাতের বিশেষত্ব হচ্ছে, তা আদায় করে নিতে হয়, সংগ্রহ করতে হয়। যাকাত প্রদানের ব্যাপারটি যাকাতদাতার উপর ছেড়ে দেয়া হয়নি। আল্লাহতালা প্রথমে মানুষকে যাকাত প্রদানে উৎসাহিত করেছেন, উদ্বুদ্ধ করেছেন, পুরস্কারের আশ্বাস দিয়েছেন, শাস্তির ভয় প্রদর্শন করেছেন। এভাবে মানুষের মন-মানসিকতা তৈরির পর যাকাতকে ধনীদের জন্য অবশ্যই দেয় এবং

গরিবদের অধিকার বলে ঘোষণা করেছেন এবং এ অধিকার সংরক্ষণের দায়িত্ব ইসলামী সরকারের উপর ন্যস্ত করেছেন। আল্লাহ দরিদ্রদের অধিকারকে তার নিজের অধিকার বলে ঘোষণা করেছেন এবং এ অধিকার সংরক্ষণের জন্য কঠোর ব্যবস্থা হিসেবে বল প্রয়োগের নির্দেশ দিয়েছেন। এ দায়িত্ব পালন করতে গিয়েই প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) যাকাত দিতে অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। আল্লামা ইউসুফ আল কারযাভী বলেন, "সম্ভবতঃ ইতিহাসে হযরত আবু বকর (রা.) পরিচালিত ইসলামী রাষ্ট্রই সর্বপ্রথম দরিদ্র, মিসকীন ও সমাজের দুর্বল ব্যক্তিদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার আদায় করার উদ্দেশ্যে যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়। সমাজের শক্তিমান লোকেরা দীর্ঘদিন পর্যন্ত এদেরকেই শোষণ করে আসছিল। কিন্তু তারা কোন শাসকের কাছে এর প্রতিকার পায়নি। ধনী ও শক্তিমানদের কাতার ছেড়ে দুর্বলদের পক্ষে দাঁড়াতে এ পর্যন্ত কেউ রাজি হয়নি। কিন্তু আবু বকর (রা.) ও তাঁর সঙ্গী সাথী সাহাবীগণ (রা.) যাকাত দিতে অস্বীকারকারীদের সৃষ্ট সংশয়ে বিভ্রান্ত হতে রাজি হননি। তাঁরা অকুণ্ঠ সংগ্রাম করে দরিদ্রদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছেন।" (ইসলামের যাকাত বিধান, পৃঃ ২২২-২২৩)।

খোলাফায়ে রাশেদীনের পর ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় ধীরে ধীরে পরিবর্তন আসে এবং বায়তুল মাল ও যাকাতের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং ব্যক্তিগতভাবে যাকাত প্রদান প্রথা প্রচলিত হয়। যাকাতের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা বিলুপ্ত হওয়ার ফলে বর্তমানে যাকাত তার প্রকৃত রূপ-সৌন্দর্য ও মহত্ব হারিয়ে ফেলেছে। ব্যক্তিগতভাবে যাকাত দানের দ্বারা দাতার মনে যেমন শ্রেষ্ঠত্ব ও অহমিকার ভাব প্রকাশ পাওয়া অসম্ভব নয়, তেমনি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যেও অধিকার পাওয়ার চেয়ে দান গ্রহণের হীনমন্যতার বোধ প্রবল হয়ে উঠতে পারে। তাছাড়া যাকাতে সামাজিক নিরাপত্তার যে গ্যারান্টি ছিল, তাও আজ আর বহাল নেই। এমতাবস্থায় প্রাতিষ্ঠানিকভাবে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় যাকাত সংগ্রহ ও বন্টনের ব্যবস্থা চালু করা একান্ত জরুরি।

১৪. যাকাতের আর্থ-সামাজিক তাৎপর্য ও পাশ্চাত্য সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা: যাকাত হচ্ছে ইসলামী সমাজে বিত্তশালী শ্রেণীর দায়িত্ব এবং সাধারণ মানুষের অধিকার। যাকাত একটি ইবাদত, একটি ধর্মীয় দায়িত্ব ও আল্লাহর অধিকার। আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে যাকাতের তাৎপর্য অপরিসীম। নিম্নে যাকাতের প্রধান প্রধান গুরুত্ব বা তাৎপর্যসমূহ তুলে ধরা হলো:

ক. যাকাত সম্পদকে পবিত্র করে: যাকাতদাতা আল্লাহর নির্দেশ পালনের জন্য এবং ইবাদতের অংশ হিসেবে যাকাত দেয়। তার মনে এ ভয় থাকে যে, যে অর্থ সে যাকাত হিসেবে দিয়েছে তার মধ্যে বা তার নিজের নিয়তের মধ্যে কোন প্রকার ত্রুটি থাকলে যাকাত কবুল হবে না; বরং গুনাহগার হতে হবে। এ চিন্তা ও অনুভূতি তাকে হালাল উপার্জনে উদ্বুদ্ধ করে এবং তার সম্পদ পবিত্র হয়। এ ছাড়া সম্পদ উপার্জনকালে মানুষ হিসেবে কিছুনা কিছু ত্রুটি থেকে যাওয়া অসম্ভব নয়। উপার্জিত সম্পদ থেকে খালেছ নিয়তে যাকাত দিলে আল্লাহ সে সব ছোটখাটো ত্রুটি মাফ করে দেবেন। রাসূলুল্লাহ (দ.) বলেছেন, "তুমি যখন তোমার মালের যাকাত দিলে তখন তা থেকে তার খারাবীটা দূর করে দিলে।"

খ. যাকাত বিত্তশালীদেরকে পরিশুদ্ধ করে: অর্থের মোহ মানুষের মধ্যে স্বার্থপরতা, লোভ-লালসা আত্মম্ভরিতা ও আত্মপূজার জন্ম দেয়। যাকাত মানুষকে অর্থের মোহ থেকে মুক্ত করে এবং স্বার্থপরতা, লোভ-লালসা, পঙ্কিলতা থেকে পবিত্র করে। এভাবে যাকাত ক্রমে সমাজ থেকে শোষণ, বঞ্চনা, বিরোধ ও হানাহানির অবসান ঘটিয়ে একতা, সহযোগিতা, সহানুভূতি ও শান্তির পথকে প্রশস্ত করে দেয়। যাকাত সম্পদ, সম্পদের অধিকারী, যাকাতের গ্রহীতা এবং সমাজকে সংশোধন ও পরিশুদ্ধ করে থাকে। মহান আল্লাহ বলেন, "তাদের ধনসম্পদ হতে যাকাত উসূল করে তাদের পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন করে দাও" (সূরা তওবা: ১০৩)।

গ. যাকাত দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়তা করে: দারিদ্র্য বিমোচনে যাকাতের ভূমিকা অপরিসীম। যাকাতের হকদারদের তালিকায় যে আট শ্রেণীর লোকদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তন্মধ্যে ফকির, মিসকীন, দাস/বান্দী, ঋণগ্রস্ত-এ চার শ্রেণীই হচ্ছে দরিদ্র শ্রেণীভুক্ত। যদি সঠিকভাবে যাকাত সংগ্রহ করা হয়, তাহলে অবশ্যই দারিদ্র্য দূর হবে। এছাড়া অন্যান্য খাতে যাদের উল্লেখ করা হয়েছে সেখানেও দরিদ্রদের সংখ্যা বেশি হওয়াই স্বাভাবিক। যাকাত তহবিল থেকে পরিকল্পিত সাহায্য পেলে তাদের অবস্থাও উন্নত হবে। দারিদ্র্য ও অভাব দূরীকরণে যাকাত কিভাবে প্রভাবশালী ভূমিকা পালন করে সে সম্পর্কে ব্যাখ্যা করা হলো:

বিশ্বের মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে প্রায় সকল মানুষের মধ্যে এ ভুল ধারণা রয়েছে যে, দরিদ্র ও অভাবগ্রস্ত লোকেরা যাকাতের যে কয়েকটি টাকা, ২/১টা কাপড় বা লুঙ্গি, কয়েক কেজি গম বা চাল পায়; তার দ্বারা কেবল সাময়িকভাবে নিজের ক্ষুধা নিবারণ করতে পারে অথবা কয়েকদিনের প্রয়োজন মেটাতে পারে। এ অর্থ শেষ হলে তারা আবার ক্ষুধাপীড়িত ও হাত পাতার অবস্থায় ফিরে যায়। যাকাত

স্থায়ীভাবে অভাব দূর করতে পারে না। যাকাত সংগ্রহ ও বন্টন ক্ষেত্রে ইসলামী নীতি থেকে বিচ্যুতিই যাকাত সম্পর্কে উক্ত ভুল ধারণার জন্ম দিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে কোন সরকার যদি সঠিকভাবে যাকাত সংগ্রহ করে এবং যাকাতের উদ্দেশ্য সামনে রেখে সঠিকভাবে যাকাত বন্টন করে, তাহলে যাকাত অবশ্যই স্থায়ীভাবে দারিদ্র দূর করবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। ফকির ও মিসকীনকে কত পরিমাণ যাকাত দিতে হবে, এ ব্যাপারে ফকীহদের অভিমত আলোচনা করলে দারিদ্র্য বিমোচনে যাকাতের ভূমিকা সহজেই উপলব্ধি করা যায়। ফকীহদের মতে, দরিদ্র ও অভাবগ্রস্ত লোকদের যাকাত তহবিল থেকে এত পরিমাণ সম্পদ প্রদান করতে হবে যা তার দারিদ্র্য ও ক্ষুধার কারণ এবং এর মূল উৎপাটন করে ফেলতে পারে, যাতে দ্বিতীয়বার আর তাদেরকে যাকাতের মুখাপেক্ষী না হতে হয়। ফকির ও মিসকীনকে কী পরিমাণ যাকাত দিতে হবে, সে ব্যাপারে ইমাম নব্বী (র.) বলেছেন যে, উভয়কে এত মাল দিতে হবে যা তাদের প্রয়োজন ও অভাবগ্রস্ততা থেকে তাকে বের করে ধনী ও প্রয়োজন না থাকার পর্যায়ে নিয়ে যায়।" মোট কথা হলো, তাদেরকে এত সম্পদ দিতে হবে, যা তাদের চিরকালের প্রয়োজন পূরণের জন্য যথেষ্ট হয়। ইমাম শাফেয়ীও এ মত সমর্থন করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ, যাকাত গ্রহীতা যদি কুটির শিল্পের সাথে সংযুক্ত হয়, তাহলে তাকে এত পরিমাণ সম্পদ দিতে হবে, যা দিয়ে সে নিজের শিল্প চালাতে পারে অথবা শিল্পের সরঞ্জাম ক্রয় করতে পারে; এর মূল্য বেশি হোক বা কম হোক এবং এর লাভ দিয়ে যাকাত গ্রহীতা তার প্রয়োজন পূরণ করতে পারে। অনুরূপভাবে যাকাতগ্রহীতা যদি রুটি ব্যবসায়ী, আতর বিক্রেতা বা রিক্সাচালক হয়, তাহলে তাদেরকে স্ব স্ব পেশার অনুপাত অর্থ দিতে হবে। দরজী, সূতার, কসাই ধোপা অথবা অন্যান্য কারিগরদের এত পরিমাণ সম্পদ দিতে হবে যা দিয়ে তারা নিজ নিজ কাজের সরঞ্জাম ক্রয় করতে পারে। যাকাত গ্রহীতা যদি কৃষিজীবী হয় তাহলে তাকে এত পরিমাণ সম্পদ দিতে হবে যাতে সে যথেষ্ট পরিমাণ আবাদযোগ্য জমি ও কৃষি সরঞ্জাম ক্রয় করে কৃষিকাজ করতে পারে। কিন্তু যাকাত গ্রহীতা যদি কুটির শিল্পী, ব্যবসায়ী বা কৃষক না হয় এবং সে যদি কোন কাজ ভাল না জানে, অথবা সে যদি কর্মক্ষম না হয়, তাহলে তাকে এমন পরিমাণ অর্থ দিতে হবে যা দিয়ে সে কোন সম্পত্তির (ঘর, দোকান প্রভৃতি) কিনে ভাড়া দেবে এবং ভাড়ার অর্থ দিয়ে নিজের অভাব পূরণ করতে থাকবে। এ হচ্ছে ইমাম শাফেয়ী (র.) ও তাঁর সমর্থকদের অভিমত। কিন্তু ইমাম মালেক, হাম্বল ও অন্যান্য কতিপয় ফকীহর মত হলো, ফকির ও মিসকীনদের এমন পরিমাণ যাকাত দিতে হবে যা দিয়ে তাঁর ও তার পরিবার পরিজনের এক বছর চলে।

উপরোক্ত উভয় প্রকার অভিমতের পশ্চাতে দলিল প্রমাণ রয়েছে। এমন কিছু ফকির মিসকীন আছে, যারা কাজ করে নিজের রুজি উপার্জন করতে পারে, যথা: কুটির শিল্পী, দোকানদার, কৃষক প্রভৃতি। কিন্তু প্রয়োজনীয় অর্থের অভাবে তারা কাজের জন্য প্রয়োজনীয় হাতিয়ার, মূলধন সামগ্রী এবং কৃষি সরঞ্জাম সংগ্রহ করতে পারে না। যাকাত তহবিল থেকে এসব লোকদের জন্য প্রয়োজনীয় হাতিয়ার, মূলধন, জমি এবং কৃষি সরঞ্জামের ব্যবস্থা করে দিতে হবে, যাতে তারা সারা জীবন ধরে রুজি-রোজগার করতে পারে এবং দ্বিতীয়বার যাকাতের মুখাপেক্ষী না হয়। যাকাতের সম্পদ নিয়ে কারখানা এবং বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান তৈরি করে এ সকল কর্মক্ষম অভাবীদের মালিকানায় দেয়া যেতে পারে। আবার এমন কতগুলো যাকাত গ্রহীতা আছে যারা কাজ করতে অক্ষম। উদাহরণ স্বরূপ, বিকলাঙ্গ অন্ধ পা-কাটা, বিধবা, শিশু প্রভৃতির কথা উল্লেখ করা যায়। এসব মুখাপেক্ষী লোকদেরকে বছরের অভাব পূরণ করার জন্য বার্ষিক ভিত্তিতে যাকাত দেয়া যেতে পারে। এমনকি যদি আশঙ্কা থাকে যে, একবারে বেশি অর্থ হাতে পেয়ে তারা অপ্রয়োজনীয় কাজে খরচ করে ফেলবে অথবা অপচয় করবে তাহলে তাদেরকে মাসিক ভিত্তিতে যাকাত দেয়া যেতে পারে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, দারিদ্র্য ও বুভুক্ষাকে চিরতরে খতম করা এবং ফকির-মিসকীনদের যাবতীয় প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থা করাই হচ্ছে যাকাতের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। হযরত ওমর (রা.) বলেছেন, "যখন তোমরা ফকির-মিসকীনকে কিছু দেবে, তখন তাকে ধনী বানিয়ে দেবে।" বস্তুত হযরত ওমর (রা.) এর কাছে কোন ফকির-মিসকীন এলে তিনি যাকাত দিয়ে তাকে সম্পদশালী করে দিতেন। শুধু ক্ষুধা নিবারণের জন্য কয়েক দিরহাম দেয়া যথেষ্ট মনে করতেন না। কোন দেশে প্রতি বছর যে পরিমাণ যাকাত সংগৃহীত হবে, যাকাত বন্টনের উল্লেখিত নীতি অনুসরণ করে তা যদি পরিকল্পিতভাবে প্রতি বছর কিছু সংখ্যক দরিদ্র লোককে স্বাবলম্বী করার লক্ষ্যে বন্টন করা হয়, তাহলে বিপুল সংখ্যক দরিদ্র লোককে কয়েক বছরেই অভাবমুক্ত করা কঠিন কাজ হবে না। সমাজে গরিব, অসহায়, দুঃস্থ ও বেকার লোকদের হাতে অর্থ বা ক্রয়ক্ষমতা থাকে না বললেই চলে। কিন্তু যাকাত বন্টন করে তাদের হাতে পৌঁছলে তাদের ক্রয়ক্ষমতা বাড়বে এবং তারা পূর্বের চেয়ে বেশি পণ্য সামগ্রী ক্রয় করবে। ফলে পণ্য সামগ্রীর চাহিদাও পূর্বের

তুলনায় বেশি হবে। বর্ধিত চাহিদা পূরণের জন্য বিনিয়োগ বাড়ানো হবে এবং উৎপাদন ও যোগান বৃদ্ধি পাবে, বিক্রয় বেশি হবে, উৎপাদনকারীদের লাভের পরিমাণ বেড়ে যাবে। যাকাত এভাবে ক্রয় ক্ষমতা সৃষ্টির মাধ্যমে চাহিদা, উৎপাদন ও মুনাফা বৃদ্ধি করে থাকে। এ উৎপাদনকারীরাই যাকাত দেয়, যা আবার বর্ধিত মুনাফা হয়ে তাদের হাতেই ফিরে আসে। মহান আল্লাহ বলেন, "আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য তোমরা যে যাকাত দাও, প্রকৃতপক্ষে সেই যাকাতই সম্পদ বৃদ্ধি করে।" (সূরা রূম: ৩৯)।

যাকাত পুঁজি তথা নগদ অর্থকে অলসভাবে ধরে রাখার পথে বাধা হিসেবে কাজ করে। সম্পদ অলসভাবে ফেলে রাখলে প্রতি বছর যাকাত দিতে দিতেই তা নিঃশেষ হয়ে যাবে। তাই যাকাতভিত্তিক অর্থনীতির যাবতীয় সম্পদ এমনভাবে বিনিয়োগ করা হবে যাতে কমপক্ষে যাকাতের হারের সমহারে আয় বাড়ানো সম্ভব হয়। অন্যথায় আসল থেকে যাকাত দিতে হবে। ফলে এ অর্থনীতিতে পূর্ণ বিনিয়োগ ও সর্বোচ্চ উৎপাদন হয়, বেকার লোকদের কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়, তাদের হাতে ক্রয় ক্ষমতা আসে, চাহিদা বাড়ে এবং উৎপাদন আবারও বৃদ্ধি পায়। এভাবে অর্থনীতি প্রবৃদ্ধির দিকে এগিয়ে যায়। এভাবে যাকাত এক দিকে ভোগ বাড়িয়ে এবং অন্যদিকে বিনিয়োগ বৃদ্ধির মাধ্যমেই উৎপাদন বাড়িয়ে থাকে যা দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়ক হয়। তাই মহান আল্লাহ বলেন, "আল্লাহ দান খয়রাতকে ক্রম বৃদ্ধি দান করেন" (বাকারা: ২৭৬)।

মহান আল্লাহ বলেন, "সম্পদ যেন কেবল তোমাদের ধনীদের মধ্যেই আবর্তিত না হয়।" (সূরা হাশর: ৭)। বস্তুতঃ আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ। তিনি জানেন, মানুষের যোগ্যতার যে তারতম্য রয়েছে, তার জন্য মানুষের উপার্জিত রুজি-রোজগারেরও কিছুটা তারতম্য হবে। যাদের সামর্থ্য বেশি তারা উপার্জন করবে এবং স্বচ্ছল জীবন যাপন করবে। কিন্তু কম যোগ্যতার কারণে কিছু লোক তাদের উপার্জন দ্বারা নিজের ভরণ-পোষণও করতে পারে না। তাছাড়া সমাজে স্বাভাবিক কারণে এতিম, বিধবা, বৃদ্ধ, রুগ্ন, পঙ্গু ও দুঃস্থ লোক আছে, যারা কিছুই উপার্জন করতে পারে না। আল্লাহ তায়ালা এসব লোকের মৌলিক প্রয়োজন পূরণের নিশ্চয়তা বিধানের উদ্দেশ্যেই স্থায়ী ব্যবস্থা হিসেবে যাকাতকে প্রাতিষ্ঠানিকরূপ দেয়ার ব্যবস্থা করেছে। সমাজে যারা স্বচ্ছল, তাদের আয়ের একটা অংশ এনে এসব অসহায় মানুষের প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে যাকাতের মাধ্যমে। উল্লেখ্য যে, ধনীদের কাছে থেকে অর্থ এনে দরিদ্রদের মধ্যে বন্টন করায় ধনীদের সম্পদ কমে যায় বলে আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে। কিন্তু ইতোপূর্বে দেখানো হয়েছে যে, এতে দরিদ্রদের মধ্যে ক্রয়-ক্ষমতা সৃষ্টি হয়। পণ্যের চাহিদা, উৎপাদন, বিক্রি ও মুনাফা বৃদ্ধি পায়। ফলে বৃত্তাকারে যাকাতের অর্থ বর্ধিত হয়ে আবার ধনীদের কাছেই ফিরে আসে। এ আবর্তনের ফলে দরিদ্রদের মধ্যে ধীরে ধীরে স্বচ্ছলতা আসে এবং ধনীদের সম্পদও বাড়তে থাকে। গোটা সমাজ স্বচ্ছল হয়ে উঠে। যাকাত গ্রহণ করার মত লোক সমাজে থাকে না। ইসলামের ইতিহাসে এর প্রমাণ রয়েছে।

যাকাত ভিত্তিক অর্থনীতিতে বিনিয়োগ সর্বাধিক হয়। ফলে বেকার সমস্যা কম থাকে। শ্রমিকের চাহিদা থাকায় মজুরি বৃদ্ধি পায়। ভিক্ষুক সমস্যা থাকে না। অসহায়, দুঃস্থ, সকল মানুষের মৌলিক প্রয়োজন পূর্ণ হওয়ায় দারিদ্র্য দূরীভূত হয় এবং সমাজে শান্তি আসে। মোট কথা, যাকাত দরিদ্র অসহায় ও দুঃস্থ মানবতার সামাজিক নিরাপত্তার স্থায়ী গ্যারান্টি এবং একই সাথে অর্থনীতির চাকাকে গতিশীল রেখে অর্থনৈতিক উন্নতি ও প্রবৃদ্ধি অর্জনের এক শক্তিশালী হাতিয়ার। ইসলামের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে একটি সুস্থ, সুন্দর আনন্দঘন ও কল্যাণমুখী সমাজ গড়ে তোলা এবং এরূপ সমাজ গড়ে তুলতে হলে সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে হবে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তার জন্য চাই মানুষের নির্মল ও পবিত্র মন এবং আত্মা। বলাবাহুল্য, একমাত্র যাকাতের মাধ্যমেই ইসলামের এ উদ্দেশ্য সাধন সম্ভব। এ মহতি উদ্দেশ্য অর্জনের মাধ্যমে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থাকে গতিশীল করার কাজে যাকাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও ঐক্যবোধ প্রতিষ্ঠা যাকাতের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। সমাজ ও সমাজের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডকে দুর্নীতিমুক্ত করা যাকাতের অন্যতম লক্ষ্য। যাকাতের বিধান ও মূল্যবোধকে অক্ষরে অক্ষরে পালন করলে মন, প্রাণ ও প্রজ্ঞা কলুষমুক্ত হয় এবং এক উন্নত জীবনবোধ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়। যাকাতের মাধ্যমে সামাজিক স্তর, মর্যাদা এবং অর্থনৈতিক অবস্থানের ক্ষেত্রে মানুষে মানুষে ব্যবধান কমিয়ে আনা সম্ভব হয়। সমাজ থেকে সকল প্রকার সংঘাত ও হানাহানি দূর করতে হলে মানুষে মানুষে সাম্য প্রতিষ্ঠিত করতে হবে এবং প্রকৃত নিরাপত্তা ও উন্নয়ন সুনিশ্চিত করতে হবে। যাকাত নীতি বাস্তবায়নের মাধ্যমে বিভিন্ন নৈতিক, ধর্মীয়, অর্থনৈতিক ও সামাজিক লাভ অর্জিত হবে। যাকাত বল্গাহীনভাবে সম্পদ আহরণের নেশাকে নিয়ন্ত্রিত করে এবং যাকাতদাতাকে দারিদ্র্য সমস্যা সমাধানের জন্য দায়িত্ব পালনে যত্নবান করবে। যাকাতের মাধ্যমে সম্পদের পুঞ্জীভবন হ্রাস পাবে এবং সামাজিক বৈষম্য কমবে। পুঁজিবাদী সমাজ

ব্যবস্থার অধীনে পাশ্চাত্য দেশসমূহে গৃহীত বেকার ভাতা, অবসরপ্রাপ্তদের কমিশনভাতা, অক্ষম ব্যক্তিদের বিনামূল্যে চিকিৎসা, আংশিক ভর্তুকীর মাধ্যমে বাসস্থানের ব্যবস্থা প্রভৃতি সামাজিক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা মানুষের বস্তুগত চাহিদা পূরণ করলেও মানবিক দিক থেকে জনগণের মমত্ববোধ স্থাপন এবং মানব জীবনের আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের ক্ষেত্রে কোন অবদান রাখতে সক্ষম হয়নি। অথচ এ সকল সমাজ নিরাপত্তামূলক কার্যক্রমের জন্য ঐসব দেশের সরকার ও জনগণকে ভর্তুকী এবং করের মাধ্যমে বিরাট অংকের অর্থ যোগান দিতে হয়েছে। নেদারল্যান্ডে বহু সংখ্যক কর্মক্ষম ব্যক্তি নিঃস্বদের তালিকায় নাম লিপিবদ্ধ করায় অক্ষম ও পঙ্গুদের পুনর্বাসন সমস্যার সমাধান হয়নি। সাবেক পশ্চিম জার্মানি ও সুইডেনে একই কারণে চিকিৎসাভাতা কার্যক্রম কর্মবিমুখতার সৃষ্টি করেছে। অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে, পাশ্চাত্য দেশসমূহে সকল জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম হাতে নেয়ার পরও ঐ সকল সমাজে অশুভ তৎপরতা সৃষ্টি হয়েছে এবং বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। এ সকল দেশ সমূহে সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা অর্থনৈতিক সংকটের আবর্তে নিপতিত হওয়ার প্রধান কারণ হল নৈতিক উৎকর্ষের অভাব। অন্যদিকে, যাকাত হচ্ছে সর্বশক্তিমান আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত বিধান। যাকাত মহান আল্লাহতায়ালা ইবাদতের অঙ্গ হিসেবে অবশ্য পালনীয় করে দিয়েছেন। অন্ন, বস্ত্র, চিকিৎসা, বাসস্থান ও শিক্ষার মত মৌলিক প্রয়োজনসমূহ সুনিশ্চিত করার জন্য মহান আল্লাহ তায়ালা কঠোর নির্দেশ দিয়েছেন। অক্ষম, দরিদ্র এবং অসহায় লোকদের প্রতি দায়িত্ববান হওয়ার জন্য মহান আল্লাহ তায়ালা জোর তাগিদ দিয়েছেন। অসহায় ও নিঃস্ব লোকদের সহায়তা করার জন্য সরকারি পর্যায়ে যাকাত তহবিল গঠনের জন্য কঠোর নির্দেশ দিয়েছে ইসলাম।

উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে এটা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, যাকাত প্রদানের তাৎপর্য অপরিসীম। যাকাত যেহেতু মহান আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ, সেহেতু এ নির্দেশ অবশ্য পালনীয়। এ নির্দেশ অমান্য করার অধিকার কারো নেই। সালাতের মত যাকাতও একটি ইবাদত। সামাজিক বা অন্য যে কোন কারণে কোন ব্যক্তি গরিব হয়ে পড়লে যাকাত তার অভাব মোচনে সহায়তা করে। যাকাত আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করে, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশ ঘটায় এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির সাথে সামাজিক সমৃদ্ধির সমন্বয় ঘটায়। যাকাত তহবিলের খরচের খাত পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, আর্থ-সামাজিক এবং ধর্মীয় এ তিন ক্ষেত্রেই যাকাত তহবিল ব্যয়ের খাত নির্দেশিত হয়েছে। যেহেতু ইসলাম একটি সামাজিক ও রাজনৈতিক বিধান, সেহেতু যাকাত প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠবে রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধানে। যাকাত সংগ্রহের সকল কার্যক্রম যাকাত তহবিল থেকেই বহন করতে হবে। যাকাত যেহেতু ব্যক্তি ও সমষ্টির কর্মকাণ্ডের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক বিদ্যমান। ব্যক্তির সৃজনশীলতা, অর্থনৈতিক লক্ষ্য এবং আধ্যাত্মিক চেতনা প্রভৃতি ইসলামী সমাজ কাঠামো ও ব্যক্তি কর্মকান্ডকে সমভাবে প্রভাবিত করে থাকে। যাকাত তহবিলের মাধ্যমে বেকার লোকদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা, অসহায় ও অক্ষম লোকদের পুনর্বাসিত করা, হত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রতি সহযোগিতার হাত প্রসারিত করা, ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির ঋণের ভার লাঘব করা প্রভৃতি হচ্ছে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার রাজনৈতিক ও সামাজিক কার্যক্রমের অংশ। সুতরাং দেখা যায় যে, যাকাত ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় স্রষ্টা কর্তৃক নির্দেশিত পথে এর সুদূর প্রসারী কার্যক্রম দিয়ে মানুষের বস্তুগত, আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক তথা সার্বিক মুক্তির নিশ্চয়তা বিধানে ভূমিকা রাখে। অথচ পাশ্চাত্য পুঁজিবাদী সমাজের সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমের একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে জনগণের অর্থনৈতিক চাহিদা পূরণ।

যাকাত কার্যক্রমের অধীনে কোন মুসলমানের দায়িত্ব রাষ্ট্রীয় আইন প্রণয়ন বা শ্রেণী সংগ্রামের দ্বারা নির্ধারিত হয় না। যাকাত এমন একটি মহান আদর্শ যা সমাজের বিত্তবান ব্যক্তিদেরকে মানব প্রেমিক হতে উদ্বুদ্ধ করে। যাকাত প্রদানের মাধ্যমে সমাজের বিত্তবান ব্যক্তিরা তাদের বিপদগ্রস্ত নিঃস্ব ভাইদেরকে ভালবাসা দিয়ে কাছে টেনে নেয়, তাদেরকে আপদকালীন সময়ে সাহায্য করে এবং দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে তাদেরকে মুক্ত করে। ইসলামী সমাজে বিত্তহীনরা বিত্তবানদের সম্পদের একটি অংশে খোদা কর্তৃক প্রাপ্ত ক্ষমতাবলে অধিকারী। যাকাতের মাধ্যমে এভাবে ধনীদের সম্পদের উপর দরিদ্রের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, পৃথিবীতে কেউ দরিদ্র হয়ে জন্মগ্রহণ করে না। সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক বা অন্য কোন প্রক্রিয়ায় কোন ব্যক্তি দরিদ্র হয়ে পড়লে তাকে দারিদ্র্য থেকে মুক্তি দেয়া ইসলামী সমাজের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। যাকাতের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে ইসলামী সমাজ এ দায়িত্ব পালন করে থাকে।

ইসলামী সমাজ যেহেতু বিভিন্ন শ্রেণীর আয়ের বৈষম্য তথা সকল প্রকারের বৈষম্য ও অসঙ্গতিকে উৎখাত করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, সেহেতু যাকাতের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে সমাজের ধনী ব্যক্তিদের উদ্বৃত্ত সম্পদ গরিবদের হাতে হস্তান্তর করা এবং মুষ্টিমেয় ব্যক্তির হাতে সম্পদের পুঞ্জীভবন রোধ

করা। নামাজের মাধ্যমে ধনী ও দরিদ্রদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের অনুভূতি জাগ্রত হয় এবং যাকাত সে অনুভূতিকে বাস্তব রূপদান করে এবং সুদৃঢ় করে। দারিদ্র্য দূরীকরণে কোন মুসলিম সচেষ্ট না হলে ইসলামের মূল চেতনা বাধাগ্রস্ত হবে। কারণ সামাজিক সাম্য, ভ্রাতৃত্ব ও সুবিচার প্রতিষ্ঠাই হচ্ছে ইসলামের প্রধান লক্ষ্য। বস্তুত: যাকাত একটা বৈপ্লবিক প্রক্রিয়া। অলস সম্পদ, কৃষি সম্পদ, খনিজ সম্পদ প্রভৃতিকে যাকাতের আওতাভুক্ত করে যাকাতলব্ধ আয়কে সকল প্রকার দারিদ্র্য দূরীকরণার্থে ব্যবহারের জন্য ইসলামে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। বলাবাহুল্য, ইউরোপীয় দেশসমূহের কাছে সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা যখন অকল্পনীয় ছিল, সে সময়ে আজ থেকে চৌদ্দশত বছর আগে যাকাতলব্ধ আয়ের সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে দারিদ্র্য সমস্যা রাষ্ট্রীয়ভাবে সমাধানের জন্য ইসলাম জোর তাগিদ দিয়েছে। হযরত রসূল করিম (দ.) বলেছেন, দারিদ্র্য হচ্ছে মানব জীবনের এক নম্বর শত্রু। দৈনন্দিন জীবনে দারিদ্র্য হচ্ছে একটি কঠোর এবং ভয়ানক সমস্যা। দারিদ্র্য ও বঞ্চনা অপরাধ প্রবণতা ও সামাজিক সংঘাতের সৃষ্টি করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দারিদ্র্যের কারণে নৈতিক অবক্ষয় দেখা দেয় এবং বিভিন্ন প্রকার অপরাধ সংঘটিত হয়। যাকাতের মাধ্যমে দারিদ্র্য নিরসনের দ্বারা এ সমস্যার সমাধান সম্ভব। যাকাত সমাজের অর্থনৈতিক ও নৈতিক অবক্ষয় রোধ করে আধ্যাত্মিক চেতনার উন্মেষ ঘটায়। ফলে ভিক্ষাবৃত্তি বন্ধ হয়ে যায়। যাকাতের সুষ্ঠু ব্যবহার ও বণ্টন হলে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অভাব ঘুচবে, ক্রয়ক্ষমতা সৃষ্টি হবে এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়বে।

১৫. যাকাত, দারিদ্র্য বিমোচন ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন: অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে যাকাতের ভূমিকা অপরিসীম। অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম পূর্বশর্ত হচ্ছে উৎপাদন বৃদ্ধি এবং উৎপাদন বৃদ্ধি নির্ভর করে উৎপাদন ক্ষমতার বৃদ্ধি, উৎপাদন ব্যবস্থাপনার উন্নতি এবং উৎপাদনে মিশ্রণ ও পদ্ধতির উন্নতির উপর। উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পেলে শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা বাড়বে। উৎপাদন ব্যবস্থাপনার উন্নতির ফলে বেকারত্ব ও অন্যান্য উপায়ে অর্থনৈতিক সম্পদ বিনষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা পাবে এবং উৎপাদন মিশ্রণ ও পদ্ধতির উন্নতি সাধনের দ্বারা সামাজিক প্রয়োজন মেটানো সম্ভব হবে। যাকাত ইসলামী রাষ্ট্রে ভোগ, উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থার উন্নতির মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সুনিশ্চিত করে। পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থার সবচেয়ে বড় অভিশাপ হলো মুষ্টিমেয় লোকের হাতে সম্পদের পুঞ্জীভবন।

মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন, "সম্পদ যেন কেবলমাত্র ধনীদের মধ্যে আবর্তিত না হয়।" (আল কুরআন ৫৯: ৭)। মহান আল্লাহ আরও বলেন, " তিনিই (আল্লাহ) তোমাদের (সকলের) জন্য ভূ-পৃষ্ঠের সমুদয় সম্পদ সৃষ্টি করেছেন।" (সূরা বাকারা: ২৯)। মুষ্টিমেয় লোকের হাতে সম্পদ কুক্ষিগত হওয়ার ফলে সামাজিক বৈষম্যের সৃষ্টি হয় এবং আর্থ সামাজিক উন্নতির পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। একচেটিয়া বাজার সৃষ্টির ফলে অর্থনৈতিক সম্পদসমূহের পূর্ণ সদ্ব্যবহার সম্ভব হয় না এবং বেকারত্বের অভিশাপ নেমে আসে।

যাকাত-পুঁজিবাদী তথা মজুতদারী ব্যবস্থার মূলে কুঠারাঘাত করেছে। যাকাত সম্পদ মজুতের বিরোধিতা করে। কারণ, মজুতকৃত সম্পদের উপরই যাকাত ধার্য করা হয়। প্রকৃতপক্ষে বিনিয়োগ বহির্ভূত কালো টাকার উপার্জন ও সম্পদ মজুত অর্থনৈতিক কার্যক্রমের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের পথে বড় অন্তরায়। মজুতদারী ও কালো টাকার বিরুদ্ধে যাকাত একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষেধক। যাকাত প্রদানের ফলে কালো ও অলস টাকা সচল হয়, বিনিয়োজিত হয় এবং ফলশ্রুতিতে সামাজিক উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। যাকাত প্রদানের ফলে দরিদ্র লোকদের ক্রয়-ক্ষমতা বৃদ্ধির দরুণ সমাজে উৎপাদিত পণ্য সামগ্রীর চাহিদা বেড়ে যায়। ফলে উৎপাদন খাতে বিনিয়োগও দ্রুত বৃদ্ধি পায়। বিনিয়োগ বৃদ্ধির ফলে উৎপাদন আরও বৃদ্ধি পাবে, অধিক শ্রমিক ও কাঁচামাল ব্যবহৃত হবে এবং বেকারত্ব হ্রাস পাবে। বেকারত্ব হ্রাস পেলে শ্রমিকের ক্রয় ক্ষমতা বাড়ে এবং এর ফলে আরও উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে গোটা দেশ ও সমাজ উন্নতি লাভ করবে। ফলে সমাজের গোটা অর্থনৈতিক কার্যক্রম বিশাল উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ডে পরিণত হয়, রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে স্থিতিশীলতা আসে এবং জাতির সার্বিক অর্থনৈতিক অগ্রগতি সাধিত হয়। যাকাতদাতা অলস টাকা সচল করার মাধ্যমে বিনিয়োগে উৎসাহিত হয় এবং যাকাত গ্রহীতা আর্থ সামাজিক নিরাপত্তার গ্যারান্টি পায়, যেহেতু যাকাতদাতা এবং যাকাত গ্রহীতা উভয়েই উপকৃত হয়। সুতরাং যাকাত নিজেই উদ্দেশ্য নয়, বরঞ্চ বৃহত্তর উদ্দেশ্য অর্জনের পন্থা মাত্র। অর্থাৎ যাকাত প্রবর্তনের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ইসলামী ভ্রাতৃত্ব ও সাম্য তথা সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করা। ইসলামী আদর্শ যত সুদৃঢ়ভাবে একটি সমাজে প্রতিষ্ঠিত হবে, তত সহজ উপায়ে যাকাত সংগ্রহ সম্ভবপর হবে। সুতরাং, মুসলিম দেশ সমূহে ইসলামী আদর্শকে পুনরুজ্জীবিত করতে হবে।

১৬. যাকাতের কার্যকারিতা:

যাকাতের ভূমিকার একটি সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ:

যাকাতের ইতিবাচক প্রভাবগুলো সম্পূর্ণরূপে যাকাতনীতির সুষ্ঠু

বাস্তবায়ন ও যাকাত তহবিলের সদ্ব্যবহারের উপর নির্ভর করে। যাকাতলব্ধ আয়ের মাধ্যমে একটি সন্তোষজনক আয় তত্ত্বাবধান ও আয় পুনর্বণ্টনের প্রধান সমস্যাটি বিশেষভাবে গরিবদের এবং সাধারণভাবে ধনীদের কর্ম প্রেরণা প্রভাবের সাথে জড়িত। যাকাত লব্ধ আয়ের পুনর্বণ্টন নীতির দ্বারা বিভিন্ন দরিদ্র শ্রেণীর মধ্যে বণ্টনগত সাম্যের অবস্থা খারাপ হতে পারে। যাকাত প্রাপ্তির মাধ্যমে একজন কর্মক্ষম গরিব পূর্বের চাইতে কম রোজগার করার প্রবণতায় ভুগতে পারে। অনুরূপভাবে উচ্চ আয়সম্পন্ন লোকজনও উচ্চ হারে যাকাত প্রদানের দ্বারা তাদের কর্মোদ্দীপনা হারাতে পারে। ফলশ্রুতিতে যাকাতলব্ধ আয়ের পরিমাণও দীর্ঘকালে হ্রাস পেতে পারে বলে অনেকে অভিমত প্রকাশ করে থাকেন। কিন্তু একজন ইসলামী ভাবধারাসম্পন্ন লোকের জন্য যাকাত যেহেতু একটি ইবাদত, সেহেতু এটাকে সে নৈতিক দায়িত্ব হিসেবে নেবে এবং ইহার দ্বারা তার আত্মা ও সম্পদ পরিশুদ্ধ হবে।

সুতরাং যাকাত প্রদানের ও গ্রহণের দ্বারা যথাক্রমে ধনী ও দরিদ্রদের কর্মহ্রাস পাবে না, কিন্তু পাশ্চাত্য পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় লালিত কর ব্যবস্থার ফলে এরূপ কর্ম প্রেরণা হ্রাসের আশঙ্কা থাকতে পারে। অবশ্য যাকাত লব্ধ আয়ের বিতরণ ব্যবস্থা যদি যথাযথভাবে পরিচালিত না হয় তাহলে আয়ের অদক্ষ বণ্টন হতে বাধ্য। আমরা পাক কুরআন মজীদ কর্তৃক নির্দেশিত যাকাতলব্ধ তহবিল ব্যয়ের সুনির্দিষ্ট আটটি খাতকে বদলাতে পারি না।

আমরা যাকাতভোগীদের কাছে যাকাত পরিশোধের পদ্ধতি বদলাতে পারি। আমরা দুটো পদ্ধতিতে যাকাতলব্ধ আয় হস্তান্তর করতে পারি: (ক) উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে এবং (খ) প্রত্যক্ষ হস্তান্তর পাওয়া পরিশোধের মাধ্যমে। বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প যথা: শিক্ষা, স্বাস্থ্যরক্ষা, বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ ও অন্যান্য সমাজকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডে গরিবদের কল্যাণার্থে যাকাতলব্ধ আয় বিনিয়োগ করা যেতে পারে। সকল ক্ষেত্রে বিনিয়োগের ফলে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে এবং ফলশ্রুতিতে গরিবদের আয় বাড়বে। এর পরোক্ষ প্রভাবের দ্বারা গোটা অর্থনীতি উপকৃত হবে এবং গুণক প্রভাবের মাধ্যমে গরিবদের আয় বহুগুণ বেড়ে যাবে। অবশ্য উৎপাদনশীলতা বাড়লেই যে গরিবদের আয় বাড়বে এটা সর্বদা সত্যি নয়। গরিবদের আয় বৃদ্ধির জন্য উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি একটা প্রয়োজনীয় শর্ত। কিন্তু চরম দারিদ্র্য স্থানীয়ভাবে নিরসনের জন্য উহা পর্যাপ্ত শর্ত নয়। উদাহরণস্বরূপ, খাদ্য উৎপাদন বাড়লেও উহা গরিব কৃষকের আয় না বাড়াতে পারে। বরঞ্চ খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে খাদ্যের দাম হ্রাস এবং শহুরে ভোক্তাদের উপকার হতে পারে। সবচেয়ে যেটা প্রয়োজনীয়, সেটা হল সংশোধনমূলক ব্যবস্থা বা বাজার বহির্ভূত প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার দ্বারা গরিবদেরকে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি, পণ্য ও সরকারি সেবা প্রদান করা, হস্তান্তর পাওনা (Transfer Payment) পরিশোধের মাধ্যমে ক্ষণস্থায়ী কল্যাণমূলক কর্মসূচি গ্রহণ না করে অ-প্রাতিষ্ঠানিক সেক্টরে (Informal sector) ক্ষুদ্র কৃষক, ব্যবসায়ী, উৎপাদন, ভূমিহীন শ্রমিক ও দিনমজুরদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা। গরিবদেরকে সম্পদের সুষম বণ্টনের দ্বারা অর্থনৈতিক জীবনের প্রধান স্রোতধারায় নিয়ে আসতে হবে। তাদের মাঝে নতুনভাবে মর্যাদাবোধ (Human dignity) প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। ভিক্ষাবৃত্তির প্রতি পরম ঘৃণা প্রদর্শন করতে হবে। সত্যিকারের নিঃস্বদেরকে চিহ্নিত করতে হবে এবং যাকাত তহবিলের মাধ্যমে তাদের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও কর্মসংস্থানের জন্য বাস্তবমুখী বিনিয়োগ পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে। প্রত্যক্ষভাবে যাকাত প্রদান (Direct transfer payment) কর্মক্ষমতাহীন লোকদের ঋণ পরিশোধ, অনাহার, বার্ধক্যজনিত রোগ-শোক প্রভৃতি ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে এবং কর্মক্ষম লোকদের বিনিয়োগ উৎপাদনের অন্তবর্তী সময়ে আর্থিক সহায়তা দানের ক্ষেত্রে কেবল সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। এরূপভাবে সুষ্ঠু ও সুষম যাকাত বণ্টন নীতি অনুসরণ করলে ইসলামী সমাজে গরিব লোকদের জীবন যাত্রার মান গ্রহণযোগ্য স্তরে উন্নীত হবে এবং অর্থনৈতিক প্রগতি ত্বরান্বিত হবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

সাম্প্রতিককালে মালয়েশিয়া যাকাত সংগ্রহ ব্যবস্থাকে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আয় বর্ধনকারী কর্মকাণ্ডের বিকাশ সাধনের জন্য একটি উৎপাদনশীল শিল্পে পরিণত করেছে। আমরা মালয়েশিয়ার উদাহরণকে অনুসরণ করে দারিদ্র্য বিমোচন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির জন্য দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারি। মালয়েশিয়ার ইসলামী পরিষদ (The Islamic Council of Wilayah Perse Kutuan Kuala Lumpur or MAIWP) যাকাত সংগ্রহের জন্য যাকাত সংগ্রহ কেন্দ্র (Pusat Pungutam Zakat or PPZ) প্রতিষ্ঠা করেছে যা ১৪টি ইসলামী পরিষদ (Islamic Council) এর মাধ্যমে যাকাত সংক্রান্ত কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে থাকে। মালয়েশিয়ায় ১৪টি প্রদেশ রয়েছে এবং প্রতিটি প্রদেশের জন্য ১টি করে ইসলামী পরিষদ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। যাকাত সংগ্রহ কেন্দ্রের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে: ১. যাকাতের সংগ্রহ বৃদ্ধি করা, ২. প্রতি বছরে যাকাত প্রদানকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা, ৩. বর্তমান প্রযুক্তির সাথে

সামঞ্জস্য বিধান করার জন্য পেশাগত ব্যবস্থাপনার সামর্থ্য বৃদ্ধি করা, ৪. সেবা প্রদানের মাধ্যমে ক্রেতার সন্তুষ্টি বৃদ্ধি করা এবং ৫. কাজের জন্য ইসলামী পরিবেশ সৃষ্টি করা। যাকাত সংগ্রহ কেন্দ্রের দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য হল: ক. সেবার মান উন্নত করা, খ. চমৎকার ব্যবস্থাপনা সুনিশ্চিত করা, গ. বিদ্যমান প্রযুক্তির প্রয়োগ বাড়ানো, এবং ঘ. মানব উন্নয়ন ও মানব সম্পদ উন্নয়নের ব্যবস্থা করা। যাকাত সংগ্রহ কেন্দ্রের মৌলিক কাজ হচ্ছে পরিকল্পনা প্রণয়ন করা, বার্ষিক বাজেট তৈরী করা, টার্গেট গ্রুপ ঠিক করা, কর্মসূচী প্রণয়ন করা, প্রকল্পের ব্যয় নির্ধারণ করা, শ্রম শক্তি নির্বাচন করা এবং প্রকল্পের সময় নির্ধারণ করা। যাকাত সংগ্রহ কেন্দ্র বিভিন্ন বিভাগ/প্রকল্পওয়ারী কর্মকান্ড সম্পাদন করে এবং ব্যাংক, সরকারী অফিস, বেসরকারী ফার্ম, মসজিদ, রেডিও, টেলিভিশন, খবরের কাগজ প্রভৃতি সংস্থার সাথে যোগাযোগ করে ও সহযোগিতা করে। যে সকল পণ্য বা বিষয়ের উপর যাকাত সংগ্রহ কেন্দ্র যাকাত সংগ্রহ করে থাকে সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল: ১. আয়, ২. ব্যবসা, ৩. সঞ্চয়, ৪. শেয়ার, ৫. প্রভিডেন্ট ফান্ড, ৬. স্বর্ণ, ৭. সম্পদ/সম্পত্তি, ৮. কৃষি উৎপাদন, ৯. গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া প্রভৃতি এবং ১০. মাটির নীচে প্রোতিত গুপ্তধন।

বিভিন্ন খাতের (আটটি খাত) উপযুক্ত যাকাতভোগীদেরকে বিভিন্ন উদ্দেশ্যের জন্য যাকাত সহায়তা দেয়া হয়। যেমন: গরীব ও নিঃস্বদেরকে প্রত্যক্ষভাবে খাদ্যের মাধ্যমে সাহায্য, আর্থিক সাহায্য, চিকিৎসা সহায়তা, শিক্ষা বৃত্তি, স্কুল ইউনিফর্ম ক্রয় সহায়তা, রমজানে ইফতারী ক্রয় সহায়তা, বাড়ী ভাড়া পরিশোধে সহায়তা, বিবাহের খরচ নির্বাহে সহায়তা, ঘর নির্মাণে সহায়তা, গৃহস্থালী দ্রব্য ক্রয়ে সহায়তা, মাতৃসেবা সহায়তা, ব্যবসার জন্য সহায়তা, দক্ষতা ও উদ্যোক্তা সৃষ্টির জন্য প্রশিক্ষণ সহায়তা, বাড়ী ঘর মেরামতের জন্য সহায়তা, কাপড় কেনার জন্য সহায়তা প্রভৃতি। যাকাত সংগ্রহ ও বণ্টনের উপরোক্ত মডেল মালয়েশিয়ায় অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে। আমরা বাংলাদেশে মালয়েশিয়ার মডেলের অনুকরণে যাকাত সংগ্রহ ও বণ্টন ব্যবস্থা প্রবর্তন করে দারিদ্র্য বিমোচন ও কর্ম সংস্থান সৃষ্টি এবং ধনী-গরীবদের মধ্যে আয় বৈষম্য কমানোর জন্য কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারি।

১৭. উপসংহার: উপরের সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে ইহা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, মানবতার দুর্দশা লাঘবে যাকাত যুগান্তকারী দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারে। যাকাতের ইতিবাচক ফল লাভ করতে হলে যাকাত সংগ্রহ ব্যবস্থার ও ব্যবস্থাপনার সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিতে হবে রাষ্ট্রকে। হযরত রাসূল করিম (দ.) ও খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে যাকাত রাষ্ট্র কর্তৃক সংগৃহীত ও বণ্টিত হোত। বাংলাদেশে ১৯৮২ সালে একটি অধ্যাদেশের মাধ্যমে যাকাত বোর্ড গঠন এবং সরকারি পর্যায়ে যাকাত সংগ্রহের ব্যবস্থা করা হলেও যাকাত প্রদানকে স্বেচ্ছামূলক রাখার ফলে উহা আজ পর্যন্ত তেমন ফলপ্রসূ হয়নি। যাকাতকে একটি জাতীয় অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। ব্যক্তিগত উদ্যোগে উহা করা সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন ব্যক্তি ও জাতির সমন্বিত প্রচেষ্টা ও উদ্যোগ। রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধানে যাকাত প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠবে এবং রাষ্ট্র উহার নিজস্ব তত্ত্বাবধানে 'আহলে নিসাব' ব্যক্তি, সরকারি কর্মচারী, ব্যবসায়ী, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, কোম্পানি এবং বেসরকারি কর্পোরেশনগুলোর নিকট থেকে যাকাত সংগ্রহ করবে। রাষ্ট্র কর্তৃক গঠিত যাকাত প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ যাকাত সংগ্রহের কাজ পরিচালনা করবে পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ কর্তৃক নির্দেশিত পথে। যাকাত প্রতিষ্ঠানের সমুদয় কর্মকাণ্ডের ব্যয়ভার যাকাত প্রতিষ্ঠান উহার নিজস্ব তহবিল থেকে নির্বাহ করবে এবং উহার যথাযথ হিসাব রক্ষণ করবে। যাকাত প্রতিষ্ঠান হবে একটি রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান এবং 'আহলে নিসাব' ব্যক্তির জন্য যাকাত হবে বাধ্যতামূলক। সুতরাং সকল যাকাতদাতা ব্যক্তি যাকাত প্রতিষ্ঠানের আওতাভুক্ত হবে এবং যাকাত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হবে। পাকিস্তান, মালয়েশিয়া প্রভৃতি গুটি কয়েক ইসলামী দেশে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে যাকাতের বাস্তব প্রয়োগ সম্পর্কিত কার্যক্রম ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে এবং ইতিবাচক ফলও পাওয়া যাচ্ছে। দারিদ্র্য নিপীড়িত বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নেও যাকাতের সুষ্ঠু প্রয়োগের মাধ্যমে যুগান্তকারী ফল লাভ করা যাবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। যাকাত তহবিলের কাঙ্ক্ষিত ব্যবহার সুনিশ্চিত করার জন্য ইসলামী আইনজ্ঞ ও চরিত্রবান লোকদের দ্বারা যাকাত প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হতে হবে। আধুনিককালে যেহেতু বহু নতুন পণ্য ও সম্পদের সৃষ্টি হয়েছে, সেহেতু ইসলামের প্রাথমিক যুগের মত যাকাতকে কেবলমাত্র প্রাথমিক পণ্যসমূহে সীমাবদ্ধতা না রেখে আধুনিক পণ্যসমূহ যেমন; শিল্প যন্ত্রপাতি, ব্যাংক নোট, শেয়ার, স্টক প্রভৃতির উপর যাকাত ধার্য করা যায় কি না বিবেচনা করে দেখা উচিত। হযরত ওমর (রা.) যাকাতের অনেক পরিবর্তন সাধন করেছিলেন। পরিবর্তিত অবস্থার সাথে সঙ্গতি রেখে মানবতার বৃহত্তর কল্যাণের জন্য যাকাতের হার নির্ধারণের ক্ষেত্রেও নমনীয় মনোভাব গ্রহণ করা যেতে পারে। অবশ্য যাকাতের পুরো সাফল্যই নির্ভর করছে আমাদের মত মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশের গোটা অর্থনীতির ইসলামীকরণের মাত্রার উপর।

শেখ ফরিদউদ্দিন মাসউদ গঞ্জেশাকর (রাহঃ) এর ফরিদপুরের আস্তানা

• ডাঃ এ. এন. এম. এ মোমিন •

হযরত শেখ খাজা মঈনউদ্দীন চিশ্‌তির (১১৪২-১২২৮) প্রধান খলীফা হযরত খাজা কুতুবউদ্দিন বখতিয়ার কাকীর খলীফা হযরত শেখ ফরিদউদ্দিন মাসউদ (রাঃ) (১১৭৭-১২৬৯)।

ফরিদপুর জেলার মানুষ যে নামের রূহানী বরকতে ধন্য, আজও ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে অনেকে বিপদে আপদে যে নামের দোহাই দিয়ে শান্তির আশায় আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করে, তিনি হযরত শেখ ফরিদউদ্দিন মাসউদ গঞ্জেশাকর (রাঃ)। সাধারণ মানুষের ধারণা এই মহান ওলীর নামানুসারে ফরিদপুর জেলার নামকরণ করা হয়।

শেখ ফরিদউদ্দিন গঞ্জেশাকর (রাঃ) বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারে এসে ফরিদপুর ও চট্টগ্রাম সহ বিভিন্ন এলাকায় ইসলাম প্রচার করেন। তাঁর এই মিশনারী কাজের ধারা ছিল যে, তিনি বিভিন্ন স্থানে তাঁবু গেড়ে নিজের সাধনার কাজে নিয়োজিত থাকতেন এবং জনগণকে ইসলামের দীক্ষা দিতেন। তাঁর এ ধরনের কাজের সন্ধান পাওয়া যায় ফরিদপুর কোর্ট প্রাঙ্গণের "শাহ ফরিদের দরগাহ" নামীয় স্থানের জনশ্রুতি থেকে। তিনি তাঁর অনুগামীদের নিয়ে এখানকার বটতলার নীচে তাঁবু গেড়ে কিছুদিন অবস্থান করেন। সেখানে তিনি তাঁর মুরীদদের আধ্যাত্মিক সাধনার দীক্ষা দিতেন এবং ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করে আগ্রহী আগন্তুকদের ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করতেন।

জন্ম ও বংশ পরিচয়: হযরত শেখ ফরিদউদ্দিন মাসউদ গঞ্জেশাকর (রাঃ) পাকিস্তানের অন্তর্গত কোটওয়াল নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম হযরত শেখ জামালউদ্দিন সুলায়মান (রহঃ)। তিনি কোটওয়ালের কাজী ছিলেন। আর শৈশবেই তাঁর পিতার মৃত্যু ঘটে। অতঃপর তাঁর বিদুষী মাতা করসুমা মতান্তরে মারাবান বানু ৫ বছর বয়সেই পুত্র শেখ ফরিদকে কোটওয়ালের মক্তবে পাঠান। সেখানে মাওলানা সাইয়েদ নাজির আহমদের নিকট মাত্র ১১ বছর বয়সে তিনি কুরআন হিফ্‌জ করেন। এ বছর মাতা নিজ পুত্রকে নিয়ে হজব্রত পালন করেন।

অতঃপর শেখ ফরিদউদ্দিন (রাঃ) মায়ের দোয়া, উৎসাহ ও পরামর্শ অনুযায়ী কান্দাহার গমন করেন। সেখানে তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে শিক্ষকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন এবং কুরআন, হাদীস, ফিকাহ প্রভৃতি বিষয়ে অভূতপূর্ব জ্ঞান অর্জন করেন। তিনি ১৮ বৎসর বয়সে হযরত খাজা বখতিয়ার কাকী (রহঃ) এর মুরীদ হন এবং তাঁর সফর সঙ্গী হওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করলে, হযরত শেখ কাকী (রাঃ) বলেন, "দীনী ইলম সমাপ্ত করে আমার নিকট এসো"।

শেখ ফরিদ (রাঃ) ইলম হাসিল সমাপ্ত করে মায়ের নিকট পৌঁছলে তিনি অতীব আনন্দে আল্লাহর শুকরিয়া জ্ঞাপন করেন। এবার দিল্লী গিয়ে নিজ মুর্শীদ বখতিয়ার কাকী (রাঃ) কে এই খোশ খবর জানানোর জন্য মায়ের অনুমতি চাইলে মা বললেন, "ইলমকে আমলে রূপান্তরিত করিতে পারিলেই কামেল লোকের দৃষ্টিতে তোমার মন হইতে সকল প্রকার সন্দেহ দূর হইবে। ইয়াকিন জন্মিবে, শয়তানের ধোঁকা হইতে রক্ষা পাওয়ার স্থায়ী শক্তি লাভ করিবে। ইলমের সারমর্ম হইল আল্লাহ্‌তায়ালার সন্তুষ্টি কিসে হয় তা বুঝিতে পারা চাক্ষুষ দর্শনে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারিলে তখন সমস্ত বাহানা এবং তাকীল নিরর্থক হয়ে যায়। এই রূপ 'ইলম' ও 'কামালিয়াত' দেশ ও বিদেশে ভ্রমণ করিয়া লাভ করিতে হয়। ইলমকে আমলের জামা পরাইয়া নিজেও লাভবান এবং দেশ-বিদেশের মানুষকে শিক্ষা দিবে"। মূলত মায়ের এরূপ উপদেশ হযরত শেখ ফরিদউদ্দীন (রাঃ) এর জীবনে কার্যকর হয়েছিল। এ সম্পর্কে তিনি নিজেও বলেন, খেলাফত লাভের পূর্বে ১৯ বৎসর এবং খিলাফত লাভের পর ২১ বছর সর্ব মোট ৪০ বছর তিনি দেশ বিদেশ ভ্রমণ করে ইসলাম প্রচার ও তপস্যা করেছেন।

ফরিদপুর জেলার ইতিবৃত্ত: ফরিদপুর নামের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় ১৬৬৪ সালের ১৬ অক্টোবর নওয়াব শায়েস্তা খাঁর রাজমহল থেকে ঢাকা আগমনের বর্ণনায়। ডঃ গোলাম সাকলায়েন বলেন, ১৮৫০ সনে যশোর জেলার কিছু এলাকা নিয়ে এই নতুন জেলার নামকরণ করা হয় ফরিদপুর। ফরিদপুর জেলার নামকরণ করা হয় সূফী সাধক হযরত শাহ ফরিদউদ্দিন মাসউদ গঞ্জেশাকর (রাঃ) এর নামানুসারে। আত্মশুদ্ধি ও ইসলাম প্রচারে হযরত শেখ ফরিদউদ্দিন মাসউদ গঞ্জেশকর (রাঃ) এই উপমহাদেশের বিভিন্ন স্থানে চিল্লা করেছিলেন। সে সব চিল্লার সাথে ফরিদপুরের চিল্লা সম্পর্কিত ঘটনাবলীর মিল পাওয়া যায়। কথিত আছে ফরিদপুর শাহ ফরিদের দরগায় যে পুরানো বট গাছটি ছিল তিনি তাঁর ছায়ায় বসে আল্লাহর আরাধনা-উপাসনা ও ইসলামের দাওয়াতের কাজ করতেন। মরমী কবি আব্দুল আলীমের একটি গানে দেখা যায়–

শেখ ফরিদ ঘর ছাড়িল, ছত্রিশ বছর ছফর করিল।

বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে তিনি ইসলাম প্রচার করেছেন। ফরিদপুর ছাড়া চট্টগ্রামে শেখ ফরিদের চশমা নামক স্থানেও তিনি কিছুদিন ছিলেন বলে জনশ্রুতি আছে। এছাড়া পাবনা জেলার একটি গ্রামের নামও এই মহান পীরের নামে নামকরণ

অর্থাৎ ফরিদপুর রাখা হয়েছে। তাছাড়া চাঁদপুর জেলার একটি থানার নাম ফরিদগঞ্জ।

"তারপর মানি আমি ফকির,
শেখ ফরিদ নেজাম আউলিয়া মানি তাঁর মুর্শিদ"।

ফরিদপুরের এই ধরনের লোককথা থেকে প্রমাণ হয় যে ফরিদপুরের শাহ ফরিদের দরগাহ নামক স্থানে দ্বাদশ শতকের ক্রান্তিলগ্নে শেখ ফরিদউদ্দিন গঞ্জেশাকর এসেছিলেন। কারণ দিল্লীর বিখ্যাত অলি হযরত শেখ নিজামউদ্দীন (রাঃ) ছিলেন তাঁর পীরালী খিলাফতের উত্তরাধিকারী ও প্রধান খলিফা।

বর্তমান ফরিদপুর জিলার পূর্বের নাম ছিল ফতেহাবাদ। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক আবুল ফজলের "আইনী আকবরী" তে উল্লেখ আছে ফতেহাবাদ ছিল হুসাইন শাহ এর প্রধান শহরের নাম। লক্ষণাবতীর শাসক জালালুউদ্দিন ফতেহ শাহ'র (১৪৮১-৮৭) নামানুসারে "ফতেহাবাদ" নামকরণ করা হয়েছে। সুলতান আলাউদ্দিন হুসাইন শাহের (১৪৯৩-১৫১৯) সময় ফরিদপুর ফতেহাবাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল যা দক্ষিণ সাহেব বাজার ও সন্দ্বীপ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী বাংলার দেওয়ানী লাভের চুক্তি অনুযায়ী ফরিদপুরের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল রাজশাহী জমিদারের আওতাভুক্ত ও ঢাকা নায়েবাতের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সময় গোয়ালন্দ মহকুমা ও গোপাল গঞ্জের অংশ যশোরের আওতাধীনে চলে যায় এবং ফরিদপুরের বাকী অংশ ঢাকা জালালপুরের অন্তর্ভুক্ত থাকে, যার থেকে ঢাকা-জালালপুর ও বাকেরগঞ্জ জেলার সৃষ্টি হয়। ১৮০৭ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকা জালালপুর থেকে জেলা সদর ফরিদপুর স্থানান্তরিত হয়।

১৮১৫ খ্রিষ্টাব্দে একজন সহকারী কালেকটরের অধীনে এই জেলাকে পৃথক জেলার মর্যাদা দেওয়া হয়। ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দে বাকেরগঞ্জ ঢাকার অফিস থেকে পৃথক হয়ে যায়। ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে গৌড়নদী থানা ঢাকা জালালপুর থেকে বাকেরগঞ্জের সংগে সংযুক্ত হয়। ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকা জালালপুর থেকে জিলার সদর দপ্তর বর্তমান ফরিদপুরে স্থানান্তরিত হয়। অতঃপর ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে একে জয়েন্ট ম্যাজেসট্রেসী এবং ডেপুটি কালেকটরশীপের মর্যাদায় উন্নীত করা হয়। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে একজন জয়েন্ট ম্যাজেসট্রেসীর ডেপুটি কালেকটরের অধীনে ফরিদপুর জেলাকে পূর্ণাংগ জেলার মর্যদায় উন্নীত করা হয়। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে মানিকগঞ্জ মহকুমাকে ফরিদপুর থেকে বিচ্ছিন্ন করে ঢাকা জেলার সাথে যুক্ত করা হয়।

১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে পাংশা এবং বালিয়াকান্দি থানা এবং পাবনা জেলার খোকসা ও কুমারখালী নিয়ে কুমারখালী প্রতিষ্ঠা করে পাবনা জেলাভুক্ত করা হয়। ১৮৭১ সালে পাংশা ও বালিকান্দি থানা ফরিদপুর জেলার গোয়ালন্দ মহকুমার সাথে যুক্ত করা হয়।

ফরিদপুরের শাহ ফরিদের দরগার অলৌকিক ঘটনাবলী: এই চিল্লাগাহে অবস্থিত বট গাছটি এখন আর নাই। সেই বট গাছের সাথে শেখ ফরিদ (রহঃ) "সালাতে মাকুসীর" মত ঘটনা জড়িত ছিল মর্মে প্রতীয়মান হয়। জনাব গোলাম সাকলায়েন তার "বাংলাদেশে সূফী সাধক" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন বট গাছটি কেটে ফেলার সময় গাছটির মাথায় আগুন জ্বলে উঠেছিল। এটা কোন ভূতুড়ে গল্প নয়। এটা আমাদের দেখা বাস্তব ঘটনা। ভয়ে কাঠুরেরা কুড়াল নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল অগ্নি নির্বাপক বাহিনী গাছটির সে আগুন নিভিয়ে ফেললেও যে খৃষ্টান কন্ট্রাকটর গাছটি কাটার দায়িত্ব নিয়েছিলেন, বেশ কিছুদিন দূরারোগ্য রোগে ভুগে তিনি মারা যান। নরেন সাহা বলেছেন, তাঁর এই দুঃসাহস করা সঠিক হয়নি। ব্যাপারটা তাকে খুব ভাবিয়ে তুলেছে। গাছটি কাটার উনিশ দিনের মধ্যে ফরিদপুরে হেলিকপ্টার দুর্ঘটনা ঘটে। এগুলি এখন কিংবদন্তীর ন্যায় অনেকের মুখে মুখে শোনা যায়, যে শকুনের জন্য হেলিকপ্টার দুর্ঘটনা হয়েছিল কে জানতো যে, ঐ শকুনটি আলোচ্য বটগাছটিতে বসবাসকারী শকুনগুলোর মধ্যে একটি কিনা। "দৈনিক পাকিস্তান" (ঢাকা) থেকে উদ্ধৃত। স্থানীয় জনশ্রুতি থেকে একটি অলৌকিক ঘটনা জানা যায়। একবার পদ্মা নদী ভাংতে ভাংতে দরগাহটির নিকটে চলে আসে। পদ্মার ভাংগন দেখে সকলের মনেই বিষাদের ছায়া নেমে আসে। তবে কি দরগাহ নদীর গর্ভে চলে যাবে? আর দেখা যাবেনা দরগাহটিকে ? হাজার হাজার মানুষ মুনাজাত করলো। আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ জানাল দরগাহটিকে রক্ষা করতে। ফরিয়াদ মঞ্জুর হয়েছিল। পদ্মার খরস্রোত স্তিমিত হয়ে গেল। নদী চলে গেল দরগাহ থেকে ১০ মাইল দূরে। সকলের মন খুশীতে ভরে গেল। এগুলো কোন কিংবদন্তী নয় বরং বাস্তব সত্য ঘটনা। এ কারণেই চিল্লাটি স্মরণীয় হয়ে আছে মানুষের মনে, গানে লেখায় ছবিতে। হযরত ফরিদউদ্দিনের ফরিদপুরে আগমন সম্পর্কে এটা বিনা দ্বিধায় বলা যায়, যে যুগে তাঁর অবির্ভাব ঘটেছিল মূলত সে যুগেই ছিল বাংলায় ইসলাম প্রচারের স্বর্ণযুগ। দ্বাদশ শতকে প্রকৃত পক্ষে ইসলাম প্রচারের জোয়ার শুরু হয়। ১৩/১৪ শতকে তাঁর পূর্ণাংগতা আসে। কাজেই হযরত ফরিদউদ্দিন মাসউদ গঞ্জেশাকর এর ইসলাম প্রচারের উদ্দেশে ফরিদপুর অঞ্চলে আগমন একটি ঐতিহাসিক সত্য মর্মে বিবেচনা করা যায়।

তথ্য নির্দেশঃ

"ফরিদপুরে ইসলাম" লেখক মোঃ আব্দুস সাত্তার, মে, ১৯৯৩ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

আধ্যাত্মিক পথ ও পাথেয়

• অধ্যক্ষ আলহাজ্ব মাওলানা গোলাম মুহাম্মদ খান সিরাজী •

বেলায়াত, সূফিতত্ত্ব ও আধ্যাত্মিকতা সম্বলিত ইতিহাস ভিত্তিক গ্রন্থ "ছিয়ারুল আউলিয়া" যা ১৩০২ ইংরেজী সন থেকে ১৩২০ ইংরেজী সন পর্যন্ত সময়কালের মধ্যে বিরচিত। কিতাবটি রচনার সূত্রপাত করেন–শায়খুশ শুয়ুখিল আলম, সুলতানুল মশায়েখ, মাহবুবে ইলাহী, হযরত খাজা নিজাম উদ্দীন আউলিয়া কুদ্দাসা সিররাহুল আজিজ। পরবর্তীতে তার পূর্ণাঙ্গতা প্রদান করেন তাঁরই মুরিদ পরিবারের সদস্য বিখ্যাত আধ্যাত্মিক মণীষী হযরত আল্লামা সৈয়দ মুহাম্মদ মুবারক মুহাম্মদ উলুবী আল কিরমানী (রহঃ) যিনি "আমীরে খুরদ" নামে সমধিক পরিচিত। মূল ফার্সী ভাষায় রচিত এ অমূল্য গ্রন্থখানা অন্যান্য ভাষাতেও অনূদিত হয়েছে। এ গ্রন্থে মাহবুবে ইলাহী খাজা নিজাম উদ্দীন (কঃ)-এর সাথে সংশ্লিষ্ট বিবিধ বিষয়ের ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর বিবরণ ও বিবৃতি প্রাধান্য পেয়েছে। এছাড়া চিশতিয়া পরিবারের অপরাপর মণীষীদের সম্পর্কে তথ্যাদিও সন্নিবেশিত হয়েছে। ৫৫০ পৃষ্ঠা কলেবরের উক্ত গ্রন্থ থেকে গুরুত্বপূর্ণ অংশবিশেষ বাংলা ভাষান্তর ও ভাব সম্প্রসারণ করতঃ আমরা উপর্যুক্ত শিরোনামে পর্বে পর্বে প্রকাশের প্রয়াস নিয়েছি।

সুলতানুল মশায়েখকে সম্মানী সিজদা দান প্রসঙ্গে : খাজা হাকিম সিনাই (র.) এ প্রসঙ্গে কতইনা সুন্দর করে ফার্সী ছন্দে ব্যক্ত করেছেন–

عاشقاں سوئے خضرتش سرمست + عقل در آستن و جان بر دست

হত বিহ্বল, হতচকিত ও জ্ঞানহারা হয়ে লোকেরা ঐ আশেকদের সম্রাট মাহবুবে ইলাহির প্রেমাশ্রমে মস্তক রাখত আর ঐ পাক দরবারের মাটিতে মুখমন্ডল মালিশ করত। এ প্রসঙ্গে কবি আমীর হাসান কত সুন্দরভাবে ফার্সী ছন্দে লিখেছেন–

نے رفتم بلا شد بوئے رفتش + خراب اندر پئے آں بوئے رفتم

আর ঐ প্রেমিক সম্প্রদায়ের বাদশাহের প্রতি প্রেমের কারণে আল্লাহ তায়ালার প্রেম-ভালবাসা নিজের অন্তরে মগজ-মস্তিষ্কে অনুভব করত।

از بوئے تو بوئے یار خود یابم + از روئے تو سرکار خود مے یابم
تا جاں نکنم فدا نیابم جاناں + جاں میدہم و نگار خود مے یابم

আল্লাহ তায়ালা এই সুগন্ধিটা নিজের মুহাব্বতের বাগান থেকে তাঁর প্রেমাস্পদবৃন্দের জাত সত্তার মধ্যে নিবিষ্ট করে রেখেছেন। যাতে করে প্রেমাগুনে জ্বলন্ত বেচারার পোড়া হৃদয়ের অন্তস্থলে ঐ খুশবু পৌঁছে যায়। যাতে সে আল্লাহর পক্ষ হতে মুহাব্বত পাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করতে পারে আর ঐ সুগন্ধির উপর নিজের প্রাণ উৎসর্গ করতে পারে, তখন তার মুখ থেকে প্রাণ উৎসর্গের আকাঙ্ক্ষা করে বিলাপ বের হয় এভাবে ফার্সী ছন্দে–

اے عارفان عاشقان جاں میدہم جاں میدہم
بر آستان دوستاں جاں میدہم جاں میدہم
گفتی اگر خواہی بقا جاں را بدہ بر بوئے ما
ایک بوئے دستان جاں میدہم جاں میدہم

আওলিয়াগণের অবস্থান স্থল সুগন্ধময়: সুলতানুল মশায়েখ (ক.) ইরশাদ করেন যে, যে স্থানে সাহেবে দিল আওলিয়া এ কিরাম একত্রিত হন, সেখানে তাদের চলে যাওয়ার পরেও অনেকক্ষণ পর্যন্ত ঐ স্থান থেকে সুগন্ধ আসতে থাকে। ঐ সুগন্ধটা বাইরের কোন সুগন্ধ হয় না। বরং তাঁদের জাত সত্তার মধ্যে বিদ্যমান সুগন্ধ। তাঁদের কারো কারো খুশবু প্রকাশ হয়ে পড়ে কারো কারো প্রকাশ হয় না। কিন্তু প্রত্যেক ওলী-দরবেশের দেহ মুবারকে বিশেষ ধরণের একটি সুগন্ধ বিরাজ করে। সুতরাং কারো অংগে কাফুরের কারো অংগে আম্বরের সুগন্ধ বিদ্যমান থাকে।

মাওলানা জহির উদ্দীন কতোয়াল সিন্ধু যিনি হাফেজে কুরআনও ছিলেন, তিনি বর্ণনা করছেন যে, এ সময় আমি হযরত সুলতানুল মশায়েখের খিদমতে উপবিষ্ট ছিলাম; সেখান থেকে উদ বা আগর এর খুশবু আসতে ছিল। আমি ডানে বামে দেখা আরম্ভ করলাম যে কোথাও আগর/উদ জ্বালিনো হচ্ছে কি না। না কোথাও আগর জ্বালানোর দৃশ্য চোখে পড়ল না। অতঃপর ধারণা করলাম হয়ত বা হুজরা শরীফের মধ্যে জ্বালানো হচ্ছে; তথাকার খাদেম সাহেব কোন কাজে হুজরা শরীফের দরজা খুলল। আমি হুজরা শরীফের অভ্যন্তরে দৃষ্টি দিলাম। দেখলাম সেখানেও কেউ নাই।

তারপর আমার অনুসন্ধিৎসু মনের অবস্থা দেখে সুলতানুল মশায়েখ (ক.) আমাকে উদ্দেশ করে বললেন যে, মাওলানা! এটা উদ বা আগরের খুশবু নয়। এটা ভিন্ন ধরণের খুশবু। এ সম্পর্কে কবি আমীর হাসান ফার্সী ছন্দে বলেন,

عطار گو بہ بند درکان را کہ من زدوست
بوے کشیدہ ام کہ بہ مشک وعنبر نیست

এক সময়ে হযরত সুলতানুল মশায়েখের পা মুবারকের একটি ছেঁড়া কাপড় বা নেকড়া যেটা দিয়ে পা মুবারক মুছতেন বা বাঁধতেন ঐ পা মুবারকের কাপড়টি হযরত সুলতানুল মশায়েখ কাজী মহিউদ্দীন কাশানী রহমাতুল্লাহি তায়ালা আলাইহিকে প্রদান করলেন। সে কাপড়টি থেকে এমন খুশবু-সুগন্ধ আসতেছিল যেটা বেহেশতী সুগন্ধির জন্য ঈর্ষার কারণ ছিল। কাজী সাহেব ঐ নেকড়া বা কাপড়টাকে অতি সম্মান ও শ্রদ্ধা সহকারে চোখে-মাথায় রেখে তাঁর ঘরে নিয়ে গেলেন এবং খুবই হেফাজত করে রাখলেন। কিছু কিছু সময় পরে তিনি সেটাকে সংরক্ষিত বাক্স থেকে বের করতেন এবং তাতে চুমু খেতেন। আর সেখান থেকে বরকত ও সৌভাগ্য অর্জন করতেন। ঐ ছেঁড়া নেকড়ায় সুগন্ধ দ্বারা নিজের আত্মা মন-মস্তিষ্ককে সুগন্ধময় করে তুলতেন। বিশ্বকবি শেখ সাদী (র.) বলেন ফার্সী ছন্দে–

ایں بوے عبیر اشنائی + از شاخۂ یار مہربان است

কাজী সাহেবের খেয়াল আসল যে, এই সুগন্ধটি স্বল্পকালীন হবে হয়তো। কিন্তু দেখা গেল কিছুকাল অতিবাহিত হওয়ার পরও তার সুগন্ধের মধ্যে তিল পরিমানও কমতি হয়নি। তিনি বিষয়টি খুব ভালভাবে পরীক্ষা করে দেখলেন। অতঃপর তিনি নিজ হাতে ঐ নেকড়াটি ধৌত করলেন। ধুয়ে ফেলার পর সেটা থেকে আরো তীব্র সুগন্ধ বের হতে লাগল। কাজী সাহেবের বিস্ময়তা আরো বেড়ে গেল। তিনি অনুসন্ধিৎসু হয়ে বাবা নিজাম মাহবুবে ইলাহী অর্থাৎ সুলতানুল মশায়েখের খিদমতে ঐ সুগন্ধের ব্যাপারে আলোচনা করলেন। সুলতানুল মশায়েখ এ ধরণের খুশবুর কথা শুনে খুব বেশী কেঁদেছিলেন।

بگریست چو ابر در بہاراں + خندید چو گل بروے یاراں

এরপর তিনি কাজী সাহেবকে উদ্দেশ করে বললেন, কাজী সাহেব এটা হলো মুহাব্বতের খুশবু বা প্রেমের সৌরভ। যে খুশবু আল্লাহ তায়ালা তার মাহবুব বা প্রেমাস্পদগণের জাত সত্তার মধ্যে বিদ্যমান রেখেছেন। এ প্রসঙ্গে শেখ সাদী (র.) ফার্সী ছন্দে বলেন–

ایں بوے نہ بوستان است + ایں بوے زکوے دوستان است

সুলতানুল মশায়েখের প্রেমাধিক্য: তাঁর বাতিন বা অন্তরাত্মা যেটা মুহাব্বতে ইলাহী বা খোদার প্রেমের সমুদ্র ছিল। প্রতি মুহূর্তে যেখানে ঢেউ খেলত। প্রেম তরঙ্গে ছিল উত্তাল। তাঁর অধিকহারে ক্রন্দনের ফলে প্রেমকূপে লুকায়িত প্রেম মুক্তা তাঁর চোখ মুবারক দিয়ে অশ্রু আকারে বেরিয়ে আসত। মনে হতো যেন পানিতে আগুন লাগানো হয়েছে। ফার্সী ছন্দ–

چشم تو کہ از چشمۂ دریاے محبت + آں چشم بجز لعل گہر بار نہ ریزد

এ প্রসঙ্গে কোন এক ওলী আল্লাহ আরবী ছন্দে ইরশাদ করেন–

لولا مدامع عشاق ولو عنهم + لبان فی الناس غزالماً والنار

অর্থাৎ: যদি আশেক-প্রেমিকদের অশ্রু এবং তার জ্বালা-পোড়া না হতো তাহলে মানুষের মধ্যে অবশ্যই আগুন ও পানির দুর্ভিক্ষ দেখা দিত।

فکل نار ممن انفاسهم قدحت + و کل ماء فمن عین لهم جار

অর্থাৎ: প্রত্যেক ধরণের আগুন তাঁর শ্বাসগুলো থেকে বের হয় এবং প্রত্যেক ধরণের পানি তাঁর চোখ থেকে প্রবাহিত হয়।

খাজা সিনায়ী কতইনা সুন্দর বলেছেন ফার্সী ছন্দে–

دل چشمش زشوق در محراب + چشمۂ آفتاب و چشمۂ آب
ہر کہ زاں چشمہ جرعہ نوشید + خلعت لی مع اللہ او پوشید

এ সবের মাধ্যমে প্রেম জগতের তৃষ্ণার্থদেরকে নিজের আগ্রহের পবিত্র শরাব দ্বারা প্লাবিত এবং তন্ময় করে দিত। ফার্সী ছন্দে বলা হয়েছে–

کسے کز جوے عشقت جرعہ یافت + بماند تا قیامت ست و مدہوش
در آں مجلس کہ بخشی جام عشقت + نگردانی محمد ﷺ را فراموش

এবার উৎসুক হৃদয়ের আহ্বান– ফার্সী ছন্দে

زدریاے جمالت چو شوم سیراب اے ساقی + کہ ہر چہ بیشتر نوشم تمنا بیشتر باشد

হাকীকতের ইশকের জঙ্গলে দিশেহারা লোকদেরকে মুহাব্বতে ইলাহীর দিকে পথ প্রদর্শন করে মনজিলে মকসুদে পৌছিয়ে দিত ঐ মহান জাতে পাক মাহবুবে ইলাহী খাজা নিজাম উদ্দীন সুলতানুল মশায়েখ (ক.)।

চেরাগে চাটগাম হাদিয়ে বাঙ্গাল হযরত পীর বদর আউলিয়া (ক.)

• এম মোখতার আলী •

প্রচলিত কিংবদন্তী মতে চট্টগ্রাম বার আউলিয়ার দেশ। আল্লাহ তালার পছন্দনীয় সংখ্যা ১২ যেই তারিখে নবী করিম (দ.) দুনিয়াতে শুভ আগমন করেছেন। এই বারবী শরীফের ফজিলত, বরকত ও কামিয়াবী হাসিলের জন্য যুগে যুগে ১২ সংখ্যা দ্বারা অলিউল্লাহগণ তাঁদের ধর্মীয় মিশন শুরু করতেন। যেমন যশোহর জেলার বার বাজার নামক স্থান এই জেলার ইসলাম প্রচারের প্রাচীন কেন্দ্রস্থল ১২ জন পীর আউলিয়া দ্বারা এই অঞ্চলে ইসলাম প্রচারিত হয়েছিল। সিলেট বিজয়ের পর ১৩০৪ খৃষ্টাব্দে তরফ যুদ্ধে সৈয়দ নাছির উদ্দীন সিপাহসালারের নেতৃত্বে ১২ জন আওলীয়া দ্বারা তরফ রাজ্য জয় করা হয়। ঠিক চট্টগ্রামে ১২ জন আওলীয়া দ্বারা ইসলাম প্রচার ও চট্টগ্রাম আবাদ করা হয়। চট্টগ্রামে সিতাকুন্ড ও বায়জিদ বোস্তামীর পাহাড়ে ১২ আওলীয়ার আস্তানা আছে। এই সব আওলিয়া এক সঙ্গে চট্টগ্রামে আসেন নি। বিভিন্ন সময়ে দুই তিন জন একদলে অথবা জনে জনে চট্টগ্রাম এসেছিলেন।

যেমন: মুজতামা গাশতান্দ বোযে আহামাহ দর চাটগাম

গাশত আবাদ আয দমে শা গো শাহায়ে চাটগাম।

অর্থ: একদিন তাঁরা সবাই চট্টগ্রামে একত্রিত হয়েছিলেন, ওই দিন থেকে তাঁদের কৃপা দৃষ্টিতে চট্টগ্রামের প্রতিটি প্রান্ত আবাদ হয়ে গেছে। বার আওলীয়ার দেশ আজ হাজার আওলীয়ার দেশে পরিণত হয়েছে। চট্টগ্রামের বনে জঙ্গলে পাহাড় পর্বতে নদীতে সমুদ্রে কত পীর দরবেশ, অলী আল্লাহ পূণ্যস্মৃতি বিজড়িত হয়ে আছে কে তার ইয়ত্তা করবে। আল্লাহ ও রসুলে পাক (দ.) এর খাস রহমত ও মেহেরবাণী ধন্য পুণ্য ভূমি চট্টগ্রাম। চট্টগ্রামে জনপ্রিয় প্রবাদ রয়েছে, 'সারেং শুটকি দরগা, এই তিনে চাটগা'।

১২ শতকের গোড়ার দিকে বখতিয়ার খিলজী নদীয়া জেলা আক্রমন করেন এবং পরে লখনৌতিতে স্বীয় রাজধানী স্থাপন করে, বাংলাদেশে মুসলমান রাজ্যের গোড়া পত্তন করেন, চট্টগ্রামে মুসলমান শাসন প্রবর্তিত হয় তারও প্রায় দেড় শত বৎসর পরে। সোনারগাঁও এর স্বাধীন সুলতান ফখর উদ্দিন মোবারক শাহ (১৩৩৮-১৩৪৯) খৃ: সর্ব প্রথম চট্টগ্রাম জয় করেন। প্রকৃতপক্ষে এই সময় থেকে চট্টগ্রামকে বার আওলিয়ার দেশরূপে গণ্য করা হয়। এই বার আওলীয়ার অন্যতম অলী হযরত পীর বদর আওলিয়া (র.)।

তাঁর মর্যাদা সূচক পূর্ণনাম হযরত মখদুম শাহ বদর উদ্দিন বদরে আলম যাহেদী। উপাধী চেরাগে চাটগাম, হাদীয়ে বাঙ্গাল ইমামুদ্দীন। তাঁকে চট্টগ্রামের অভিভাবক আওলীয়াও বলা হয়। চট্টগ্রাম শহরের বখশী বাজারের দক্ষিণ দিকে সরকারী সড়কের পার্শ্বস্থ উচু জায়গাটি বদর শাহের দরগাহ নামে বিখ্যাত। এইখানে তাঁর প্রধান এবাদতখানা ছিল। এর পশ্চিম দিকে বদর মসজিদ ও বদর পুকুর রয়েছে। মৌলভী গোলাম নবী গযনবী কৃত এবং নৌল কিশওয়ার প্রেসের ছাপানো (মের আতুল কাওনাইন) কিতাবের ৩৭১ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, হযরত শাহ বদর উদ্দীন বদরে আলম যাহেদী (র.) ভারতের মিরাঠ শহরে জন্মগ্রহণ করেন।

তাঁর পূর্ব পুরুষ বিখ্যাত অলীয়ে কামেল হযরত সেহাবউদ্দিন মক্কী (র.) তাঁর পুত্র হযরত ফখরুদ্দিন কে এলহাম যোগে ভারতে আসার অনুমতি দেন। হযরত ফখরুদ্দিন (র.) ভারতে পদার্পন করিয়া বর্তমান যেখানে মিরাঠ শহর অবস্থিত সেখানকার জঙ্গলে অবস্থান করত আল্লাহ তালার এবাদতে লিপ্ত হন। ক্রমশ তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়লে অনেক লোক তাঁর শিষ্য ও ভক্ত হয়ে গেল। এমনকি তখনকার রাজাও তাঁর মুরিদ হয়ে গেলেন এবং সেই জঙ্গল মানুষ দ্বারা আবাদ হতে লাগল। হযরত ফখরুদ্দিনের পুত্র হযরত সেহাবউদ্দিন কোন কারণে রাজার হাতে শহীদ হন, ফলে রাজপুরী সহ এর পার্শ্ববর্তী এলাকা সমুদয় অঞ্চল আল্লাহ তালার গজবে বীরান এবং অরণ্যে পরিণত হয়। হযরত সেহাবউদ্দিন শহীদ হওয়ার কালে তাঁর বিবি গর্ভ অবস্থায় ছিলেন। এই গর্ভে একজন (মাদারজাত) অলী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর নাম ফখরুদ্দিন রাখা হয়। তাঁর প্রচেষ্টায় ঐ অনাবাদী অঞ্চলটি পুনরায় আবাদ হয়ে যায়। হযরত ফখরুদ্দিন (র.) (২য়) এর পাঁচজন সন্তান ছিল। পাঁচপুত্রের অন্যতম কনিষ্ঠ পুত্র হলেন আমাদের আলোচ্য হযরত শাহ বদর আওলীয়া (র.) হযরত বদর উদ্দিন (র.) এবং তাঁর দুই ভাই দুগ্ধপোষ্য ছিল। হযরত মখদুম জালাল উদ্দিন জাহানিয়া জাহাগোশত ভ্রমণ করতে সেখানে উপস্থিত হন। হযরত সেহাবউদ্দিন এর পৌত্রগণকে দেখে দোয়া করলেন এবং বললেন এই ছেলে একদিন দেশের জন্য সূর্যতুল্য হবে। অবশেষে হযরত বদর উদ্দিন (র.) জাহেরী বাতেনী এলম শিক্ষা শেষ করেন। তখন হযরত ফখর উদ্দিন (র.) (২য়) তাঁর বড় ছেলে হযরত শাহ ছদর উদ্দিন ছদরে আলম (র.) কে জৌনপুরের বেলায়ত দান

করেন। হযরত বদর উদ্দিন (র.) কে বিহার এবং বাংলাদেশের লবণাক্ত সাগরের কুল পর্যন্ত বেলায়ত দেন। হযরত বদর উদ্দিন (র.) যখন বিহার ও বাংলাদেশে আসার ইচ্ছা করলেন এখানে (বিহার বাংলাদেশে) তখন হযরত মখদুম শরফুদ্দিন ইয়াহিয়া মনিরী ছিলেন। আপন পিতার নিকট জিজ্ঞাসা করলেন, আমাকে বিহার এবং বাংলা দেশের বেলায়ত দান করা হয়েছে। অথচ সেইখানে হযরত মখদুম শরফ উদ্দিন (র.) বর্তমান রয়েছেন। তাঁর পিতা বললেন মখদুম সাহেবের নিকট পত্র লিখে তিনি যা বলেন তা কর। হযরত বদরুদ্দিন (র.) পত্র লিখলে মখদুম সাহেব উত্তরে অনুমতি দিয়া বললেন। তুমি ঘুরে ফিরে এ দিকে আস। তিনি অনুমতি পেয়ে ২/৩ শত দরবেশ ও ভক্তসহ বাংলাদেশের দিকে আগমন করলেন। চট্টগ্রাম শহরে উপস্থিত হয়ে লবণাক্ত সমুদ্রের কুলে এবাদতখানা তৈরি করে আল্লাহ তালার এবাদত ও লোকের হেদায়তের কাজে লিপ্ত হলেন। তাঁর ছেলে হযরত সেহাবউদ্দিন কত্যালও তাঁর সঙ্গে ছিল। তখনকার রাজার ভগ্নি নিঃসন্তান থাকায় অনেক সময় দোয়ার জন্য হযরত সাহাবউদ্দিন কত্যালের নিকট উপস্থিত হত তিনি হুজরার দরজা বন্দ করে রাখতেন। এবং দেখা দিতেন না। কথিত আছে সেই রাজার একটি গরু ছিল যা পুজার জন্য রেখেছিলেন।

হযরত বদর শাহ (র.) এর ভক্ত মুরিদান ঐ গরুটিকে যবেহ করে খেয়ে ফেলেন। রাজা এ সংবাদ পেয়ে তাদের গ্রেপ্তার করার জন্য লোক পাঠান। গ্রেপ্তারের জন্য লোক এসে উপস্থিত হলে সকলেই তাঁর ছেলে সেহাবউদ্দিন কত্যালের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, ইনি আমাদের সর্দার। তাঁকে রাজার নিকট নেয়ার জন্য খুবই চেষ্টা চলল, এবং দু'চারজন লোক তাঁকে ধরে ফেলল। কিন্তু তাঁকে আপন অবস্থান হতে সরাতে পারলনা বরং তিনি যখন হাত নাড়লেন সকলে পড়ে মরে রইল। এভাবে রাজার অনেক লোক মারা গেল। রাজা এ সংবাদ শুনে অনেক হাতি আরোহী সৈন্য প্রেরণ করলেন। এতে দেশে হট্টগোল শুরু হল। রাজার বোন দালানের উপর হতে এ অবস্থা দেখে রাজাকে বলল, ভাই এরা দরবেশ লোক তাঁদের উপর কোন রকম অত্যাচার হলে আপনার অনিষ্ট হবে। পূজার জন্য অন্য একটি গরু ক্রয় করুন। তাঁদের প্রতি কোন অবিচার করবেন না। রাজা বোনের অনুরোধ অনুযায়ী প্রতিশোধ নেয়ার চিন্তা ছেড়ে দিলেন।

এ ঘটনার পর রাজার বোন এক রাতে আবার হযরত শাহ সেহাবউদ্দিন কত্যালের নিকট উপস্থিত হয়। হুজরার দরজা খুলে গেলে সে শাহ সাহেবের দেখা পেয়ে বড়ই আনন্দিত হয়। রাজার বোন পুত্র সন্তানের জন্য দোয়া প্রার্থনা করে। হযরত শাহ সাহেব তাকে দু'টি নতুন কমলা লেবু খেতে দেন। এবং বলেন, তোমার দু'টি ছেলে হবে। তারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করবে। রাজার বোন বাড়ী ফিরে গোসল করে কমলা লেবু দু'টি খেয়ে ফেলে। সে রাতেই গর্ভবতী হয়। গর্ভের সময় অতিবাহিত হওয়ার পর দু'টি পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করে। রাজার বোন সন্তান দু'টিকে হযরত শাহ সেহাবউদ্দিনের খেদমতে এনে বলল, আপনার নিকটই এরা প্রতিপালিত হবে।

যুবক হওয়ার পর তারা দু'জনেই ইসলাম গ্রহণ করে। তারা বুদ্ধি জ্ঞানে পূর্ণ হলে রাজা তাদের শত্রু হয়ে দাঁড়ায়। তাদেরকে কী করে হত্যা করা যায় এ চিন্তায় রাজা তখন বিভোর। কিন্তু একদিন দু'জনই রাজার আন্দর মহলে গিয়ে ঠিক আনন্দোৎসবের মধ্যে রাজাকে হত্যা করে ফেলে এবং মাথা কেটে প্রাসাদের উপর গিয়ে সৈন্যগণকে তা দেখায়। তারা সবাইকে তাদের আনুগত্য স্বীকার করতে আহ্বান জানায়। অতএব একজন রাজা ও অপরজন মন্ত্রী হন। তাঁরা সমস্ত ব্রাহ্মণ ও অমুসলমানগণকে বিভিন্ন অপরাধে হত্যা করে। কথিত আছে যে হযরত বদর শাহ (রা.) চট্টগ্রাম এসে শহর থেকে বার মাইল ব্যবধানে বোয়ালখালী (কুড়াইল্লা মোড়া নামীয়) পাহাড়ের মধ্যে অবস্থান করছিলেন। এখানে বদর শাহের একটি আসন আছে। তিনি সেখানে হেয়ানাই নামীয় এক নাপিতকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেন। সেই নও মুসলিমের দু'ছেলে আত্মারাম ও মহিষচন্দ্রও মুসলমান হয়। প্রথম ছেলের নাম আতিকুল্লা দ্বিতীয় ছেলের নাম মোহাম্মদ শরীফ রাখা হয়। দু'জনই মুসলমান হওয়ার পর বেশি বেশি ইবাদত ও রিয়াজত করতে থাকেন। তখনকার মুসলমান ও অমুসলমান বাদশাহ তাঁদের ইবাদত ও রিয়াজত দেখে অনেক জায়গা জমিন তাঁদের দান করেন, সেই জায়গা ও জমিন এই যাবত নয়া পাড়া এবং শরফভাটা গ্রামে বর্তমান আছে। (সূত্র বাংলাদেশের পীর আউলিয়াগণ ৩৭৩ পৃষ্ঠা)

মনে হয় পরবর্তীতে তাঁদের বংশধরগণ দরগাহ শরীফের খেদমতে নিয়োজিত ছিল।

হযরত বদর শাহ (র.) এর বংশধর সম্পর্কে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা: ফখরে বাংলা মাওলানা আবদুল হামিদ সাহেব বলেছেন, একদা খুব সম্ভব রজব মাস হবে তিনি খাঁ বাহাদুর সৈয়দ আবদুল মোমেন সাহেবের (তিনি এককালে চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনার ছিলেন।) পিতা নওয়াব শামসুল উলামা মৌলবি সৈয়দ আবদুল জব্বার খাঁ বাহাদুর মরহুমের

অতিথি ছিলেন। তাঁর সঙ্গে আরো কয়েকজন বড়লোক ছিলেন। তারা যত দিন সেখানে ছিলেন গোস্ত মাংস ছাড়া নিরামিষ তরকারী বা শাক সবজী দ্বারা তাঁদের আপ্যায়ন করা হচ্ছিল। বিদায়ের দিন নওয়াব সাহেব সকলের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে বললেন, আমরা এ মাসে গোস্ত মাছ কিছুই খেতে পারি না। কারণ আমাদের পিতামহ হযরত শাহ বদর (র.) যখন তাঁর মুরীদান এবং ভক্তগণকে নিয়ে বাংলাদেশে আসছিলেন তখন তাঁর মুরিদ ও ভক্তগণ এক বৃদ্ধার গাভী যবেহ করে খেয়েছিলেন। বৃদ্ধা হযরত বদর শাহ (র.) এর নিকট নালিশ করলে তিনি বড় রাগান্বিত হয়ে বলেন, এ মাসে আমার মুরীদানের মধ্যে কেউ গোস্ত মাংস খেতে পারবে না। খাওয়া নিষেধ। তখন হতে তাঁর বংশধর এবং মুরীদানের মধ্যে এই প্রথা চলে আসছে যে এ মাসে ঘরে গোস্ত মাংস পাক করা যায় না। এও দেখা গেছে যে, যদি কোন বাবুর্চি বা পাচক পাক ঘরে গুপ্তভাবে গোস্ত বা মাছ পাক করে খায় তার মুখ হতে রক্ত বের হয়। যারা সত্যিকার হযরত বদর শাহ (র.) এর বংশধর তাঁদের মাঝে এ নিয়ম প্রচলন আছে। এটি একটি পরীক্ষিত ব্যাপার। কিন্তু অপ্রিয় হলেও সত্যি যে, চট্টগ্রামের ইতিহাস তথা চট্টগ্রামে ইসলাম প্রচার প্রতিষ্ঠার এবং পীর আউলিয়ার সঠিক তথ্য নির্ভর কোন পুস্তক লিপিবদ্ধ নেই। দুর্ভাগ্যের বিষয় আমাদের ঐতিহাসিক ও গবেষকগণ এ বিষয়ে তাঁদের কর্তব্য যথোচিতভাবে পালন করতে পারেননি। যে কারণেই হোক না কেন জাতি হিসাবে তা আমাদের জন্য অগৌরবের। ইতিহাস বা সঠিক তথ্য পাওয়া না গেলে অনেকটা জনশ্রুতির উপর নির্ভর করতে হয়। চট্টগ্রামে হযরত বদর শাহ (র.) দরগাহে একখানি আরবী শিলালিপি সযত্নে রক্ষিত আছে। কিছু ভক্ত অধিক যত্ন করে লেখার উপর এতবেশী চুনকাম করেছেন যে লেখা পড়ার কোন উপায় নেই। এক সময় যদি লেখাগুলো পাঠ উদ্ধার করা যেত হয়তো কিছু সঠিক তথ্য পাওয়া যেত। সে যাই হোক পীর বদরের ঐতিহাসিকতা নিয়ে বিতর্কের অন্ত নেই। প্রথমত: বদর নামীয় অনেক পীরের নাম পাওয়া যায়, যেমন পীর বদর, বদর শাহ, বদর আউলিয়া, বদর ই আলম, পীর বদর উদ্দিন, বদরে আলম, শেখ বদরই আলম, পীর বদরের সমাধি ও বিভিন্ন জায়গায় দৃষ্ট হয়। যেমন বর্ধমান জেলার কালনায়, দিনাজপুরের হেসতাবাদে। একমাত্র চট্টগ্রাম জেলায় বোয়ালখালী, পটিয়া, রাউজান এবং রাঙ্গুনিয়া থানার চারটি বিভিন্ন জায়গায় বদর শাহের দরগাহ দৃষ্ট হয়। আকিয়াবে বদর মোকাম ও পীর বদর কর্তৃক সাধনার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত চিল্লাখানা আছে। সেখানে পীর বদরের (র.) পায়ের চিহ্ন এবং হাঁটুর দাগসহ পাথর দেখা যায়। (চট্টগ্রামে ইসলাম) জনশ্রুতি আছে যে, হযরত বদর আউলিয়ার নামে বারো শহরে ১২টি মাজার প্রতিষ্ঠা হবে। তবে প্রকৃত পক্ষে কোন মাজার সঠিক তা নিয়ে লোক সমাজে বিতর্ক সৃষ্টি হবে। নানান স্থানে বদর শাহের মাজার সে কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। শুধু চট্টগ্রাম নয়। চট্টগ্রাম থেকে আরকান এমনকি মালয় পর্যন্ত পীর বদর সম্মানিত। তাঁর মাজার সংখ্যাও স্মরণযোগ্য। পীর আওউলিয়াদের জন্য এটি অসম্ভব কিছু নয় তাঁরা একই সময় বিভিন্ন স্থানে বিরাজ করতে পারেন বিশেষ করে আল্লাহর ওলীদের আস্তানা চিল্লা, মাজার শরীফ দোয়া কবুলের স্থান, সুতরাং প্রেমিক ভক্তগণ যেখানে ভক্তি সহকারে স্মরণ করবে সেখানে হযরত বদর আউলিয়ার ফয়েজ বরকত হাসিল করা যাবে। বিহারের (বিহার শরীফে) ছোট দরগার পীর বদর উদ্দিন বদরে আলম এর সমাধি আছে। চট্টগ্রামের ও বিহারের পীর বদর অভিন্ন বলে সাম্প্রতিক গবেষণায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ঐতিহাসিক ব্লকম্যান এবং শামসুল ওলামা হিদায়ত হোসেন উভয়ের মতেই বদর উদ্দিন বদরে আলম চট্টগ্রামে অবস্থান করেন। ড. আ. করিমের মতেও উভয়ই অভিন্ন ব্যক্তি। মি. সিদ্দীক খান এ সম্পর্কে যাবতীয় প্রমাণ পরীক্ষা পূর্বক সিদ্ধান্ত করেছেন যে উভয়ই অভিন্ন ব্যক্তি। (সূত্র: চট্টগ্রামের ইতিহাস, পুরানা আমল)

অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি মোহাম্মদ মুকিম তাঁর গুলে বাকাওয়ালী গ্রন্থে আত্ম বিবরণী লিখতে গিয়ে চট্টগ্রামের কয়েকজন সুফির নাম করেছেন। যেমন:

চাটিগ্রাম ধৈন্য মোহাত বাখান
ধার্মিক অতিথশাল ফকির আস্তান
শা জাহিদ সাহা পন্তি আর শাহা পীর
হাদী বাদশাহ আর সাহা সোন্দর ফকির।
শাহ ছোলতান আর সাহা শেখ ফরিদ
শহরের মৈদ্ধা বুরা বদরের স্থিত।

কবি মোহাম্মদ খানের বিবরণ মতে কবির পূর্বপুরুষ শাহ খলীল পীরের সাথে চট্টগ্রাম এসে পৌঁছলে কদল খান গাজী ও পীর বদর আলমের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। এই বদর শাহ চট্টগ্রামের হিন্দু মুসলমানের কাছে অত্যন্ত সম্মানিত। এবং চট্টগ্রামস্থ তাঁর দরগাহে হাজার হাজার লোক শ্রদ্ধা নিবেদন করতে যায়। জনশ্রুতি মতে বদর শাহই চট্টগ্রামে ইসলাম প্রচার করেন। সেকালে চট্টগ্রামে জীন পরীদের আড্ডা ছিল। বদর শাহ জীন পরীদের দূর করার উদ্দেশ্যে চট্টগ্রাম আগমন

করেন। কিন্তু জীন পরীদের প্রভাবে ইসলাম প্রচারে বিশেষ সুবিধা হতনা। হযরত বদর শাহ (র.) তখন জীন পরীদের কাছ থেকে মাত্র একখানি চাটি জ্বালাবার স্থানের অনুমতি নেন। কিন্তু তিনি চাটি জ্বালাবার পর চাটির আলো ক্রমশ বাড়তে বাড়তে সারা চট্টগ্রামে ছড়িয়ে পড়ে; ফলে জীনেরাও চট্টগ্রাম থেকে চিরতরে পালিয়ে যায়, এভাবে সারা চট্টগ্রামের লোক পীর বদর আউলিয়ার প্রভাবে ইসলাম গ্রহণ করে। অনেকে মনে করেন যে বদর শাহের চাটি থেকে চাটিগ্রাম বা চট্টগ্রাম নামের উৎপত্তি। চট্টগ্রাম মুমিন রোড়ে হযরত বদর শাহ (র.) চাটির পাহাড় বা চেরাগী পাহাড় এখনও দৃষ্ট হয়।

"মাসকানে জিন্নও পরী বুদাহ বেলাশক চাটগাম

এক চেরাগে আন্দাযাহ যুশা জা গেরফতাহ লা কালাম,

অর্থ: নিসন্দেহে চট্টগ্রাম ছিল জ্বীন পরীর বাসস্থান। তিনি মাত্র একটি চেরাগ পরিমান জায়গা তাদের থেকে নিয়েছিলেন। এতে সবাই একমত।

"পসবতদরী জ আয তাওয়াজ্জহাত আশাহ বদর,

যী শহরে হাস্তন্দ উ শা জুমলাগী রাখতে সফর,

অর্থ: অতঃপর ক্রমান্বয়ে ওই শাহ বদরের তাওয়াজ্জুহর কারণে এ শহর থেকে তারা সফর করে চলে গেছে।

বাদে চন্দী মাসকানে ইনসান গাশতাহ আ মাকান,

মুসাম্মা গাশত ঈ বালদাহ বশহরে চাটগাম।

অর্থ: কিছুদিন পর ওই স্থান মানুষের বাসস্থান পরিণত হয়েছে। তারপর এ শহরের নাম হলো চাটগাম। (চট্টগ্রাম)

চট্টগ্রামে পীর বদর আউলিয়ার প্রভাব অত্যন্ত বেশী। প্রত্যেক বছর ২৯ রমজান বদর পাতিস্থ দরগাহে বার্ষিক উরস সম্পন্ন হয়। ঐ সময় হাজার হাজার লোক উৎসবে মেতে ওঠে। তাছাড়া অন্যান্য সময়ও অনেক লোক দরগাহ জেয়ারত ও ফাতিহা পাঠ করেন। ভিন্ন ধর্মের লোকেরাও ভক্তি সহকারে বাতি জালিয়ে তাদের মানত আদায় করে। চট্টগ্রামের নাবিকরা এবং খেলোয়াড়রা বদর শাহের নাম স্মরণ করে থাকে। নাবিকরা সমুদ্র যাওয়ার পূর্বে বলে থাকে: আমরা আছি পোলাপান, গাজী গঙ্গা নিগাবান, শিরে গঙ্গা দরিয়া, পাঁচ পীর বদর বদর। তারা আরও বলে দরিয়াকে পাঁচ পয়সা বদর বদর। চট্টগ্রামের ছেলেরা অবসর সময়ে বিশেষ করে শীতকালে হাডুডু, দাড়ীয়া বান্ধা খেলার প্রারম্ভেও বদর বদর চিৎকার করে থাকে।

চট্টগ্রামস্থ বদর শাহের দরগাহে নৌকার মত লম্বা একখন্ড পাথর রক্ষিত আছে। খাদেমরা বলেন যে পাথর খন্ডে সওয়ার হয়ে বদর শাহ চট্টগ্রাম আগমন করেন। ঐ পাথর খন্ডে পানি জমা করে রাখা হয় এবং ভক্তরা ঐ পানি পান করে পূণ্য লাভ করেন বা ক্ষতস্থানে লাগিয়ে বেদনা উপশম করেন। (সূত্র: চট্টগ্রামে ইসলাম)

ইন্তিকাল: কথিত আছে যে হযরত মখদুম শরফউদ্দিন ইয়াহিয়া মুনিরী (র.) ইন্তিকালের সময় বলে ছিলেন, আমার ইন্তিকালের পর আমার মখদুমজাদা এখানে আসবে। তিনি ৭৮২ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন, তাঁর মাজার বিহার শরীফে অবস্থিত। হযরত পীর বদর আওলীয়া দীর্ঘ সময়ব্যাপী চট্টগ্রামে অবস্থান করে হাদিয়ে বাংলা হিসাবে হিদায়তের কার্য সমাধা করে ৭৮২ হিজরী সনে বিহার শরীফ চলে যান। সেখানে গিয়ে তিনি সমুদ্রের কুলে হুজরা নির্মাণ করতে মনস্থ করেন। লোকে আরজ করল এখানে হুজরা নির্মিত হলে সমুদ্রের ঢেউয়ে বিনষ্ট হয়ে যাবে, তিনি কারো কথায় কর্ণপাত না করে হুজরা নির্মাণ করেন। অতঃপর যখন ঢেউ আসতে আরম্ভ করল, তখন তিনি ঢেউকে অন্য দিকে সরে যেতে নির্দেশ দিলেন। এর পর তাঁর হুজরার কাছে আর কোন দিন ঢেউ আসে নি। উল্লেখ্য যে, হযরত বদর আউলিয়া (র.) দীর্ঘ হায়াত পেয়েছিলেন। তিনি ১৫০ বছর বেঁচে ছিলেন। ১৪৪০ খৃষ্টাব্দে ৮৪৪ হিজরী সালে ২৯ রমজান মতান্তর ১ শাওয়াল বিহার শরীফ তিনি ইন্তিকাল করেন এবং বিহারের ছোট দরগাহে সমাহিত হন।

কথিত আছে মখদুম শাহ বদরুদ্দীন বদরে আলম যাহেদী (র.) (যাঁহার মাজার বিহারে অবস্থিত) এবং তাঁর পুত্র হযরত সেহাবউদ্দিন কত্তাল (র.) এর (যাঁর মাজার ছোরন জিলার অন্তর্গত ছিওয়ানের এলাকা চৌকি কাতাল পুরে অবস্থিত।) দু'জনই বড় বুজুর্গ ছিলেন। বিবি আবদাল নামে তাঁর এক কন্যা ছিল, তিনি আধ্যাত্মিক গুণে গুণান্বিত কশফ কেরামতের অধিকারিনী ছিলেন, এবং এবাদতের মধ্যে অদ্বিতীয়া ছিলেন। বিবি আবদালের অবস্থা মেরাতুল কাওনাইন কিতাবে বিস্তারিতভাবে লিখা হয়েছে।

তাঁর আওলাদের মধ্যে নওয়াব আব্দুল জব্বার খাঁ বাহাদুরের বংশধর বড়ই প্রসিদ্ধ। আর কতেক বংশধর বিহারের জিলা ছারনের অন্তর্গত মৌজা চৌকি কাতালপুরে অবস্থিত। শাহ যাহের হুসাইনের পুত্র শাহ মযহের হুসাইন তাঁহার প্রসিদ্ধ গদিনশীন। (সূত্র: মেরআতুল কাওনাইন)

কেরামত: একদা সমুদ্রে ভীষণ তরঙ্গ উঠেছিল, হযরত শাহ বদর (র.) সে দিকে তাকিয়ে রইলেন, এক সওদাগরের

জাহাজ সেই তরঙ্গের মধ্যে পড়ে ডুবে যাবার উপক্রম হয়েছিল। জাহাজের কাপ্তান মানত করল যে আমার জাহাজ যদি তুফানের হাত হতে রক্ষা পায় তাহলে সমুদ্র সৈকতের সে দরবেশ (শাহ বদর) কে আমার একচতুর্থাংশ মাল নজরানা দেবো। খোদার মহিমা মানত করার সাথে সথে তুফান থেমে গেল। জাহাজ নিরাপদে তীরে পৌঁছল কিন্তু কাপ্তান তার কথামত কাজ করলনা। সে সামান্য কিছু মাল এনে দরবেশকে নজরানা দিল। দেখে দরবেশ বললেন, তোমার এই জাহাজখানা এমনিই তীরে পৌঁছেনি। এটাকে রক্ষা করতে বেশ পরিশ্রম করতে হয়েছে। হযরত বদর শাহের কথা শুনে কাপ্তান অবাক হয়ে গেল।

তার বিশ্বাস জন্মাল যে ইনি একজন কামেল দরবেশ। তাই সে তৎক্ষনাৎ তাঁর পায়ে পড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করল এবং প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী জাহাজে ফিরে গিয়ে একচতুর্থাংশ মাল এনে দরবেশের সামনে পেশ করল। দরবেশ সেই মাল ভক্ত মুরিদানের মধ্যে বন্টন করে দিয়ে বললেন, ভবিষ্যতে আর কখনো কথার খেলাফ করবেনা।

আকিয়াবের বদর মোকাম নির্মাণ সম্পর্কে ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের ডেপুটি কমিশনার কর্নেল নেলসন ডেভিস কর্তৃক প্রদত্ত বিবরণে জানা যায় ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দে পীর বদর উদ্দীন বদরই আলমের সম্মানে এটি নির্মিত হয়। বিবরণে আরও প্রকাশ আঠার শতকের গোড়ার দিকে অনুমানিক ১৭৩৬ খৃষ্টাব্দে চাঁদ সওদাগর ও মানিক সওদাগর নামক চট্টগ্রামের দু সওদাগর ভাই বেসিন থেকে আকিয়াব হয়ে বদর মোকাম এর নিকট পৌঁছলে তাদের পানীয় পানি শেষ হয়ে যায়। তারা জাহাজ নোঙ্গর করে সেখান থেকে পানি সংগ্রহ করে। ঐ রাত্রে পীর বদর (র.) স্বপ্নে মানিক সওদাগরকে আদেশ দেন তাঁরা যেন যেখান থেকে পানি যোগাড় করেছে সেখানে গুহা তৈরি করে দেয়। মানিক সওদাগর তাদের আর্থিক অস্বচ্ছলতার কথা জানালে পীর সাহেব বলেন যে তাদের সকল হলুদ সোনায় পরিণত হবে। সকালে ঘুম ভাঙ্গার পর দুই ভাই সত্যি সত্যি দেখে অবাক হয়ে যায় যে, তাদের জাহাজের সমস্ত হলুদ সোনায় পরিণত হয়েছে। অতঃপর তারা বদর মোকাম নামী ঐ পাকা দালান গুলি তৈরি করে দেয়। ঐ দিন থেকে হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ সকলে ঐ স্থানকে শ্রদ্ধা জানিয়ে আসছে।

মওলায়ে রহমান বাবা ভাণ্ডারী কেবলা কাবার আগমনঃ গাউসুল আ'যম মাইজভাণ্ডারী (ক.) এর নির্দেশে বাহারে সানী গাউসুল আ'যম বাবা ভাণ্ডারী কেবলা কাবা (ক.) সফরের একপর্যায়ে হযরত শাহ আমানত (র.) দরবার হয়ে হযরত বদর আওলিয়ার দরগাহে গিয়া উপস্থিত হন এবং বেলায়তের মোতলাকার আলোকে আলোকিত হওয়ার জন্য বাতেনী নির্দেশ দিয়ে অন্যত্র চলে যান। এর পর হতে মাইজভাণ্ডারী খলিফা, ভক্ত ও অলী প্রেমিকগণের আসা যাওয়া বেড়ে যায় এবং দরগাহ শরীফ এর যাবতীয় অনুষ্ঠান, ওরশ শরীফ এবং দরগাহের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পেতে থাকে।

"মাখযানে কাশফ ও কারামত বুদ মাশহুরে যমা, তরবতশরা বাগে জান্নাত সায আয় রব্বে জাহা।"

অর্থঃ তিনি ছিলেন কাশফ ও কারামতের ভাণ্ডার এবং যুগের প্রসিদ্ধ অলী, হে বিশ্ব জগতের প্রতিপালক তাঁর কবর শরীফকে জান্নাতের বাগান করে দিন।

"দর বদর পাক্তী বেদানী রওয়ায়ে পুর নুরে উ, মরদুমা পুর ফয়জে বাশদ দা ইমান আয যাতে উ"

অর্থঃ তাঁর নুরানী মাযার বদর পাতিতে অবস্থিত, মানুষ সব সময় তার পবিত্র সত্তা থেকে ফয়জ প্রাপ্ত হচ্ছেন।

"ইলতিজা দারম বতু আয় হযরত শাহ বদর, ই দিলে তারীকে মা রওশন কুনী মিসলে বদর"

অর্থঃ হে হযরত শাহ বদর আপনার দরবারে এ আশাই রাখি, আমাদের এ অন্ধকার হৃদয়কে পুর্ণিমা চাঁদের মতো আলোকিত করে দিন।

"বাহরে আ শাহ বদর সদ মারহাবা সদ মারহাবা, আয দোয়া যদাহ আউলিয়া উ রা বেদানী বে খাতা"

অর্থঃ ওই শাহ বদরকে শত স্বাগতম শত মোবারকবাদ, তাঁকে নিঃসন্দেহে বার আওলিয়ার অন্যতম বলে জানবে। (সূত্রঃ দেওয়ানে আজিজ, ইমাম শেরে বাংলা র.)

আল্লাহ রব্বুল আলামীন আমাদেরকে হযরত বদর আওলিয়ার উছিলায় দুনিয়া আখিরাতের কামিয়াবী হাসিল করার তৌফিক দান করুন। আমিন বেহুরমতে সাইয়্যিদুল মুরসালীন।

তথ্যসূত্রঃ

১. বাংলাদেশের পীর আউলিয়াগণ, মাওলানা এম ওবাইদুল হক, প্রিন্সিপাল ফেনী আলীয়া মাদ্রাসা।

২. তাযকেরাতুল আউলিয়া, মাওলানা নুরুর রহমান, ৬ষ্ঠ খন্ড।

৩. বিষয় ভিত্তিক কারামতে আওলিয়া।

৪. দিওয়ান ই আযীয।

পীরের প্রতি আনুগত্য

• মোঃ গোলাম রসূল •

মহানবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তাফা (দ.) কে মহান আল্লাহ কুরআন পাকের বাস্তব রূপ ও অবিকল ছবি হিসাবে সৃষ্টি করেছিলেন। অপরদিকে কুরআন হাদীস থেকে আধ্যাত্মিক জ্ঞান অর্জন পূর্বক আত্মশুদ্ধির বিধানাবলীতে পারদর্শী হওয়ার নিমিত্তে আল্লাহ তা'আলা সর্বযুগে অগণিত আউলিয়া কিরাম ও সুফীকুলের সিলসিলা সৃষ্টি করেছেন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন হযরত গাউসুল আ'যম শাহ মুহিউদ্দিন আব্দুল কাদের জিলানী (রা.), হযরত খাজা মঈনুদ্দিন চিশ্‌তি (রা.), হযরত ইমাম গাজ্জালী (রা.), মাইজভাণ্ডার শরীফের হযরত গাউসুল আ'যম আহমদ উল্লাহ (ক.), হযরত গোলামুর রহমান (ক.) হযরত দেলওয়ার হোসাইন (ক.), হযরত শাহানশাহ সৈয়দ জিয়াউল হক (ক.) প্রভৃতি আউলিয়া কিরাম। এই সকল বিশ্ববিখ্যাত ওলীগণ ছিলেন কুরআন-হাদীসের বিশারদ। তাঁরা জীবনের প্রতি মুহূর্ত ব্যয় করেছেন আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের জন্য এবং তাঁরা মানবতার কল্যাণে নিবেদিত প্রাণ ছিলেন। তাঁরা মানুষকে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উন্নতির পথ প্রদর্শন করেছেন। তাই তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা আমাদের সকলের একান্ত কর্তব্য। অপরদিকে মারিফাত অর্জনের নামে শরীয়তের আহকাম ও বিধান বর্জনকারী কিছু ভণ্ডপীর দেখা যায় এবং তাদের সম্পর্কে হযরত মৌলানা রুমী (রা.) বলেছেন– "মানুষের আকৃতিতে বহু শয়তান বিচরণ করে, সুতরাং যারতার হাতে মুরীদ হওয়া উচিত নহে।"

মৌলানা রুমী (রা.) মসনবী শরীফে শরীয়ত ও মারিফাতের গূঢ় রহস্যের বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। কামিল পীরের সংসর্গে ও সাহচর্যে থেকে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের প্রতি উৎসাহ দিয়েছেন। তিনি বলতেন– "আমার পীরের কথা স্মরণ হলে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা আমার জন্য অবশ্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়।" আমাদের সকলের বেলায়ও একই কথা প্রযোজ্য। কিন্তু আমাদের দেশে কিছু অর্বাচীন লোক আছে যারা পীরের দরবারে গেলে কটূক্তি করে এবং অশ্রদ্ধা প্রকাশ করে– যা নিতান্তই গর্হিত কাজ। খাঁটি পীর মানব জাতিকে গোমরাহী ও পথভ্রষ্টতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করে অধ্যাত্মিক উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছে দিতে পারেন। মৌলানা রুমী (রা.) বলেন–

কার পাকাঁরা কেয়াসায খোদ মগীর,
গরচে মানাদ দর নাবেশ্‌তান শের ও শীর

অর্থ: বৎস! পাক লোকদের কার্যকলাপকে নিজের কাজের উপর কিয়াস করিওনা। কেননা, শের এবং শীর দুইটি শব্দের রূপ এক প্রকার হইলেও অর্থ একরকম নহে! শের অর্থ বাঘ, শীর অর্থ দুধ।

শীর আঁ বাশদ কে মরদ উরা খোরাদ,
শের আঁ বাশদ কে মরদাম রা দারদ

অর্থ: শীর এমন পদার্থ, যাহা মানুষে খায়; আর শের এমন জন্তু যে মানুষকে ফাড়িয়া চিরিয়া ফেলে।

"জুমলা আলম যী সবব গোমরাহ শোদ,
কম কাসে যাবদালে হক আগাহ শোদ"

অর্থ: অধিকাংশ লোক এই জন্য পথভ্রষ্ট হইয়াছে যে, তাহারা ওলী আল্লাহর অবস্থা অবগত নহে। অর্থাৎ আবদাল, কুতুব, ওলী আল্লাহগণ মানুষের মধ্যে মিলিয়া-মিশিয়া থাকেন, তাহাদিগকে চিনিবার জন্য তত্ত্বজ্ঞানী দৃষ্টি এবং বিশুদ্ধ বাতেনী জ্ঞানের প্রয়োজন। কিন্তু যাহারা সকলকে নিজের মত মনে করে, তাহারা তাঁহাদিগকে চিনিতে পারে না।

"হামসরী বা আম্বিয়া বর দাশতান্দ
আওলিয়ারা হামচু খোদ পেন্দাশ্‌তান্দ"

অর্থ: সুতরাং নিজেদের ভুল খেয়ালের দ্বারা কখনও তাহারা নিজদিগকে আম্বিয়ায়ে কিরামের মত দাবী করিয়া বসে, আবার কোন সময়, আল্লাহর ওলীগণকে নিজেদের সমান মনে করিয়া থাকে। অর্থাৎ অসৎ হতভাগাদের অন্তর্দৃষ্টি সজীব হয় না, কাজেই ভাল-মন্দ তাহাদের নযরে এক রকম মনে হয়; এই কারণেই তাহারা আম্বিয়ায়ে কিরামদের সমকক্ষতার দাবী করিত। আম্বিয়া কিরামদিগকে নিজেদের মত মনে করিয়া বলিত, আমরাও মানুষ, নবীগণও মানুষ; আমরাও খাই, ঘুমাই, নবীগণও খান, ঘুমান। কুরআন পাকে আছে– "কাফিরের দল বলিত, তোমরাও আমাদের মতই মানুষ।" তাহাদের অন্ধ দিলে এই কথা আসিল না যে, উভয়ের মধ্যে বিরাট পার্থক্য বর্তমান আছে।

"মোমেনী রা বোর্দ বাশদ আকেবাত
বর মোনাফেক মত আন্দর আখিরাত"

অর্থাৎ: পরিশেষে মুমিনের জয় হইবে, এবং আখিরাতে মুনাফিকদের পরাজয় হইবে।

মৌলানা রুমী (রা.) মুর্শিদ ওলীর আনুগত্যের প্রতি উৎসাহ প্রদান পূর্বক বলেছেন–

"সায়ায়ে এযদাঁ চু বাশদ দাইয়াআশ
ওয়া রেহানাদ আয খেয়ালো সাইয়াআশ"

অর্থ: আল্লাহর ছায়া যদি তাহার মুর্শিদ হয়, তবে তিনি বাজে খেয়ালও ছায়া হইতে ত্বরাইয়া লইবেন।

অর্থাৎ কামিল পীরের তরফ হইতে তাওয়াজ্জুহ এবং তরবিয়্যত প্রদান; আর তরীকত, হাকিকত, ও মারিফাত অন্বেষণকারীর পক্ষ হইতে পীরের আনুগত্য এবং অনুসরণই সেই পরিত্রাণ লাভের উপায়।

"সাইয়ায়ে এযদাঁ বুওয়াদ বান্দাহ খোদা
মুরদায়ে ঈঁ আলামো যিন্দা খোদা"

অর্থ: আল্লাহর কামিল বান্দা আল্লাহর ছায়া, তিনি দুনিয়ার সম্পর্ক হইতে মৃত এবং আল্লাহ তা'আলার সম্পর্ক হইতে জীবিত। অর্থাৎ দুনিয়ার সাথে তাঁহার কোন সম্পর্ক নাই, তিনি সর্বদা আল্লাহ তা'আলার চিন্তা ও ধ্যানে নিমগ্ন। কাজেই এমন ব্যক্তির প্রতি রোগ নির্ণয় ব্যাপারে সন্দিহান না হইয়া যথাশীঘ্র তাঁহার শরনাপন্ন হও।

সূত্র: মসনবী শরীফ

শাহানশাহ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীর খলিফা ও টীকা-ভাষ্যকার সৈয়দ নুরুল বখতেয়ার শাহ

• ড. সেলিম জাহাঙ্গীর •

সময়কাল: ৭ সেপ্টেম্বর ১৯৮৩, স্থান: কর্ণফুলী হোটেল, তবলছড়ি বাজার, রাঙামাটি।

মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফের গাউসিয়া হক মনজিল এস্তেজামিয়া কমিটির সভাপতি সৈয়দ নুরুল বখতেয়ার শাহ এবং শহর চট্টগ্রামের বিপনী বিতানের স্বর্ণের দোকান কারুকাঞ্চন এর মালিক পাঁচকড়ি বাবুকে সাথে নিয়ে শাহানশাহ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী রাঙ্গামাটিতে গিয়ে তৎকালীন রাঙ্গামাটির পৌরসভার চেয়ারম্যান ও অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট তফাজ্জল হোসেন চৌধুরীর উল্লিখিত কর্ণফুলী হোটেলে অবস্থান করেন। এ সময় শাহানশাহ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী কথা প্রসঙ্গে তদীয় প্রধান খলিফা সৈয়দ নুরুল বখতেয়ার শাহের পরিচয় তুলে ধরেন এভাবে–

"ইনি (সৈয়দ নুরুল বখতেয়ার) আমার বাবা জানের (সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারীর) খলিফা। গাউসুল আ'যমের (মাইজভাণ্ডারী তরিকার প্রবর্তক সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারীর) শানে, বাবা জানের শানে পঁচিশটি (২৫) বই লিখেছেন। আমার সেখানে ৫০/৬০ লাখ টাকা খরচ করে ক'বছর ওরশ করাতে এখন লোকজন পোক জোঁকের মতো ভিড় করছে।" অতঃপর তাঁরই নির্দেশে চৌধুরী সাহেব বখতেয়ার শাহের পা ছুঁয়ে সালাম করেন।

এখানে তিনটি বিষয় প্রনিধাণযোগ্য: ১. গাউসুলআ'যম ও বাবাজানের শানে ২৫টি বই লেখার কথা। উল্লেখ্য, জাগতিকভাবে লেখালেখির সাথে পরিপূর্ণভাবে সম্পর্কহীন একজন অহোরাত্র নিবেদিত খাদেম সম্পর্কে ২৫টি বই লেখার মতো মন্তব্য রীতিমতো বিস্ময়কর। এর হাকিকতি ব্যাখ্যা আজও অনুদঘাটিত। সাধারণভাবে দরবারের শান মানে বিস্ময়কর বলিষ্ঠ ভূমিকার আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি হিসেবে একে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। কিন্তু ২৫টি বই লেখার সুনির্দিষ্ট হাকিকত আরো বিশ্লেষণ ও অনুসন্ধানের দাবী রাখে।

২. ৫০/৬০ লাখ টাকা খরচ করে ওরশ প্রসঙ্গ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, শাহানশাহ সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীকে কেন্দ্র করে গাউসিয়া হক মনজিলে ওরশ শরীফ প্রচলন বিষয়ে একান্ত ভূমিকা পালন করেছিলেন সৈয়দ নুরুল বখতেয়ার শাহ। এ ক্ষেত্রে এ বিষয়টিও পর্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধানের দাবী রাখে।

৩. পীরের উপস্থিতিতে, স্বয়ং পীরের নির্দেশে স্বীয় মুরিদকে পা ছুঁয়ে সালামের নির্দেশনা। এটি সাধারণভাবে বখতেয়ার সাহেবকে সম্মান জানানোর নির্দেশনাসূচক আনুষ্ঠানিক ঘোষণা বলে অনুমেয় কিন্তু সুনির্দিষ্ট হাকিকত আরো অনুসন্ধানের অপেক্ষা রাখে।

একদিনে একই বৈঠকে সৈয়দ নুরুল বখতেয়ার শাহ সম্পর্কে এহেন উচ্চ মার্গীয় তিনটি তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় আমাদের রীতিমতো বিস্মিত করে। মৌলিকভাবে শাহানশাহ সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীর আধ্যাত্মিক মহিমা এবং তাঁরই প্রধান খলিফা হিসেবে সৈয়দ নুরুল বখতেয়ার শাহের অবস্থান চিহ্নিতকরণ এবং প্রকাশ্যে তা ঘোষণার মধ্যদিয়ে সাধারণ্যে বখতেয়ার শাহের পরিচিতি পর্ব এবং একইসাথে আধ্যাত্মিক উৎকর্ষতার বিষয়টি পরিপূর্ণমাত্রায় অনুমোদন এবং সুস্পষ্ট করে দিলেন।

বলাবাহুল্য, একই সাথে মাইজভাণ্ডার শরীফের দুই মহান আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্বের খলিফা হওয়ার গৌরব অর্জনের মাধ্যমে এ পরিমন্ডলে মর্যাদাপূর্ণ নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন সৈয়দ নুরুল বখতেয়ার শাহ।

অভয় আর আশ্বস্ততার চলমান প্রতীক হিসেবে গভীর শীতল স্নিগ্ধ এক জোড়া চোখ: প্রথম দর্শনে এক চাহনিতেই কী এক মোহনী শক্তিতে বিনি সুতোর মালায় গেঁথে ফেলেন অবলীলাক্রমে। তিনিই মাইজভাণ্ডারের ইতিহাসে চিরায়ত আশেকের শাশ্বত প্রতিফলন সৈয়দ নুরুল বখতেয়ার শাহ। সৌম্যদর্শন, দৃষ্টিনন্দন বাবরীচুল, মুখে সাদা দাঁড়ি, তাম্বুল বিলাসে ঈষৎ লোহিত বর্ণ ধারণে ওষ্ঠাধর; স্বাভাবিকের মধ্যেও কী যেন এক অস্বাভাবিক আকর্ষণে মানুষকে, বিশেষত জিজ্ঞাসুজনদের টেনে নেয় কাছে– অতিকাছে।

চলমান সময়কালে মাইজভাণ্ডার বিষয়ক আগ্রহী জনদের, বিশেষত জীবিত কিংবদন্তির আধ্যাত্মিক পুরুষ শাহানশাহ

সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীর অহোরাত্র আধ্যাত্মিক রহস্যপূর্ণ জীবন ও ব্যক্ত অব্যক্ত, কথিত-অকথিত যাবতীয় কর্মকাণ্ডের অবিসংবাদিত বিশ্বস্ততম টীকা-ভাষ্যকার হিসেবে তাঁর সমীহ জাগানিয়া অবস্থানের বিষয়টি সংশ্লিষ্ট সকলেরই জানা।

শহর চট্টগ্রামের কেসিদে রোডস্থ হোটেল টিউলিপের সেই ঐতিহাসিক চিলেকোঠা, মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফে গাউসিয়া হক মনজিলের পুরাতন মেহমান খানা; মূলত এই দুই'ই ছিল তাঁর জনসম্পৃক্ত কেন্দ্র।

আমার আগ্রহ মাইজভাণ্ডার বিষয়ে জাগতিক-আধ্যাত্মিক, প্রচলিত-অপ্রচলিত নানা বিষয়। সাধারণ থেকে তাত্ত্বিক সব ছোট বড় জিজ্ঞাসা আমলে নেন তিনি আগ্রহের সাথে, জবাব দেন সযতনে সচেতন প্রয়াসে। সব প্রশ্নের জবাব যথাযথ না হলেও এ জবাবে সংশ্লিষ্ট তত্ত্ব-তথ্যের অনেক বিষয়ে চিন্তার নতুন দিগন্ত খুলে দেয়। এই নির্মল জ্ঞান চর্চার, বিশেষত মাইজভাণ্ডার কেন্দ্রিক যাবতীয় তাত্ত্বিক দার্শনিক আলোচনা-পর্যালোচনার সময় বারংবার এ কথাই মনে হয়েছে যে, তাঁর উত্তরগুলো ছিল অর্জিত জ্ঞানের বিধিবদ্ধ কাঠামোর মধ্য থেকে নয়, তা ছিল ঐশী জ্ঞান ও আলোর প্রতিধ্বনি ও প্রতিচ্ছবি।

বখতেয়ার মামার এ বিশেষত্বের কিয়দংশ অবলোকন করেছি শাহানশাহ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী বিষয়ক আলোচনায়, বিশেষত তাঁর আধ্যাত্মিক রহস্যপূর্ণ কর্মকাণ্ড এবং পবিত্র কালাম সমূহের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে। আমার কাছে মনে হয়েছে শাহানশাহ বাবা জানের টীকা-ভাষ্যকার হিসেবেই তাঁর ভূমিকা ছিল মুখ্য। প্রায় প্রতিদিন প্রতিনিয়ত ঘটে যাওয়া অসংখ্য ঘটনার মধ্যে আমার দেখা প্রফেসর মুহাম্মদ খালেদের ঘটনার নিবেদনে প্রত্যক্ষ করেছি বখতেয়ার মামার অনবদ্য ভূমিকা।

সময়কাল ১৯৮৭ সালের মাঝামাঝি। চট্টগ্রামের আজাদী-সম্পাদক প্রফেসর মুহম্মদ খালেদ প্যারালাইসিসে আক্রান্ত হয়ে অবশ ডান হাত সহ অবশ-প্রায় শরীর নিয়ে মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফে শাহানশাহ বাবা জানের দোয়া-দয়ার প্রত্যাশী হয়ে বখতেয়ার মামার মাধ্যমে আর্জি পেশ করেন। শাহানশাহ বাবাজান মুখে বিন্দুমাত্র কোন শব্দ উচ্চারণ না করে একটা গ্যাস লাইটার দীর্ঘক্ষণ জ্বালিয়ে রাখেন সর্বোচ্চ উজ্জ্বল শিখায়।

সে দিন বখতেয়ার শাহের মধ্যে সিদ্ধান্ত, উপলব্ধি ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে যে প্রচন্ড আত্মপ্রত্যয়ী ভাব এবং স্থির বাচনভঙ্গি অবলোকন করেছিলাম তা সত্যিই বিস্ময়কর। আমাদের সকলের উপস্থিতিতে তিনি দ্বিধাহীন চিত্তে উচ্চারণ করেন- "প্রফেসর সাহেব আপনি সুস্থ হয়ে উঠবেন এবং আপনার জনপ্রিয়তাও অত্যধিক বেড়ে যাবে।"

বলাবাহুল্য, প্রফেসর খালেদের এই সুস্থতা এবং জনপ্রিয়তার ভবিষ্যদ্বাণী পরবর্তী সময়ে বাস্তবে অবলোকন করেছি আমরা প্রত্যক্ষদর্শীরাও। শাহানশাহ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীর কেরামতের টীকা ভাষ্যকার হিসেবে বখতেয়ার শাহের সেদিনের ভূমিকা আজও আমার স্মৃতিতে অম্লান। বলাবাহুল্য, কিংদন্তির চলমান আধ্যাত্মিক পুরুষ শাহানশাহ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীকে গভীর থেকে গভীরে উপলব্ধির ক্ষেত্রে প্রস্তুতি পর্ব হিসেবে সৈয়দ নুরুল বখতেয়ার শাহের জীবনী পর্যালোচনা রীতিমতো অনিবার্য আবশ্যক বিষয়ে পর্যবসিত।

মাইজভাণ্ডার বিষয়ে আমার তাত্ত্বিক গবেষণা, বিশেষত ঢাকা বাংলা একাডেমীতে গবেষণাবৃত্তি নিয়ে গবেষণার সময় ভেতরে-বাইরের কথিত-অকথিত বৈরী পরিবেশের প্রেক্ষিতে শাহানশাহ বাবাজানের কাছে আমার পক্ষ থেকে আরজি পেশ এবং তৎপ্রেক্ষিতে বাবাজানের আধ্যাত্মিক রহস্যপূর্ণ কথাবার্তা ও ইঙ্গিতপূর্ণ আচরণের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ দেওয়ার দায়িত্ব পালন করতেন বখতেয়ার মামা। মামাকে দেখেছি প্রচন্ড আগ্রহ নিয়ে আমাকে সাথে রেখে গভীররাতে (২-৩টা) বাবাজানের কাছে আরজি পেশ করতেন গবেষণার সফল সমাপ্তি ও তা গ্রন্থকারে প্রকাশের বিষয়ে।

আরজি পেশ এবং তৎপ্রেক্ষিতে তা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে বখতেয়ার মামার যে নিপুণ বর্ণনা তা আমাকে বিস্মিত করতো এবং শিহরণও জাগাতো। এহেন শিহরণেরই যেন প্রতিধ্বনি গীতিকার শেখ নিজাম উদ্দীনের কণ্ঠে-

খলিলুল্লাহ মাইজভাণ্ডারীর গুণের সীমা নাই, পাউসিয়তের প্রেম খেলা খেলে সর্বদাই।

কুতুবুল এরশাদ হয়ে, শাহানশাহী তত্ত্ব পেয়ে, ঘোষণা করে গেল অবিরত তাই।

এক নজরে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে সৈয়দ নুরুল বখতেয়ার শাহের বিশেষত্ব

১. নিজের সমগ্র জীবন সত্তাকে মাইজভাণ্ডারের প্রচার প্রসারে ওয়াক্‌ফ করে দিয়েছিলেন সচেতন প্রয়াসে।

২. প্রথম জীবনে অসিয়ে গাউসুলআ'যম সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারীর কদমে তাঁর মুরিদ হিসেবে নিজেকে নিবেদন করে দিয়েছিলেন পরিপূর্ণমাত্রায়।

৩. দ্বিধা-দ্বন্দ্ব সত্ত্বেও পরবর্তীকালে তাঁরই নির্দেশে তদীয় প্রথম পুত্র সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীর খেদমতে আত্মনিবেদন।

৪. সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীর খেদমতে নিজেকে উজাড় করে দিয়ে পরিপূর্ণমাত্রায় সর্বোচ্চ অবস্থানে পৌঁছানোর প্রেক্ষিতে 'আল্লাহর খলিল' উপাধিতে অভিষিক্ত।

৫. একইসাথে দুই মহান অলি আল্লাহর খলিফা হওয়ার এক অনন্য ইতিহাস সৈয়দ নুরুল বখতেয়ার শাহ।

৬. পারিবারিকভাবে দরবারের সাথে সম্পর্কিত হওয়া সত্ত্বেও কখনো এ পরিচয়ে নিজেকে পরিচিত করেননি, বরঞ্চ দরবারের নিবেদিত খাদেম হিসেবে থাকতেই স্বাচ্ছন্দ বোধ করতেন বেশী।

৭. শাহানশাহ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীর নতুন আবাসস্থল কেন্দ্রিক 'গাউসিয়া হক মনজিল' নামকরণ এবং এর এন্তেজামিয়া কমিটির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি হিসেবে আজীবন এ দায়িত্ব নিষ্ঠা ও সততার সাথে আত্মবিশ্বাস ও মর্যাদাপূর্ণভাবে প্রতিপালন।

৮. গাউসিয়া হক মনজিলের মুখপত্র, ১৯৮৫ সালে প্রথম প্রকাশিত 'মাসিক আলোকধারার' 'আতুরঘর' ছিল তাঁর হোটেল টিউলিপের সেই ছোট্ট আস্তানা, আর তিনি ছিলেন এর সম্পাদক মন্ডলীর সভাপতি।

৯. শাহানশাহ বাবা জানের উপস্থিতিতে তাঁরই নির্দেশে গাউসিয়া হক মনজিলের ৬ তলা বিশিষ্ট মেহমানখানার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করে ছিলেন সৈয়দ নুরুল বখতেয়ার শাহ।

১০. গাউসিয়া হক মনজিলের এন্তেজামিয়া কমিটির সাধারণ সম্পাদক (শুরু থেকে চলমান) জামাল আহমদ সিকদারের মাইজভাণ্ডার শরীফের সাথে সম্পৃক্ততা এবং দরবারের লেখালেখির কর্মকান্ডে আত্মনিয়োগেও মূল অনুঘটকের ভূমিকায় ছিলেন সৈয়দ নুরুল বখতেয়ার শাহ।

১১. মাইজভাণ্ডারের ইতিহাসে শাহানশাহ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীর জীবদ্দশায় ১৯৮২ সালে তাঁর জীবনী গ্রন্থ প্রকাশ এক ঐতিহাসিক ঘটনা। এ গ্রন্থ প্রণয়নের মৌলিক ধারণা, পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত এবং প্রকাশের ক্ষেত্রে লেখক জামাল আহমদ সিকদারের অনুপ্রেরণার মূল উৎসই ছিলেন সৈয়দ নুরুল বখতেয়ার শাহ।

১২. ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে সর্বাত্মক সাহায্য সহযোগিতা তাঁর আরেক অনন্য বিশিষ্টতা।

১৩. মাইজভাণ্ডারী দর্শনের সপ্ত পদ্ধতির জীবনাচরণের বাস্তব চক্ষুগ্রাহ্য প্রতিফলনই ছিল তাঁর সমগ্র জীবনসত্তা।

১৪. মাইজভাণ্ডারী দর্শনের অবিসংবাদিত আকর গ্রন্থ বেলায়তে মোতলাকার দৃশ্যমান ব্যক্তিসত্তা।

১৫. সাধারণ্যে মাইজভাণ্ডারী দর্শনের মানসপুত্র: আমাদের এ পর্যন্ত আলোচনা প্রায়ক্ষেত্রেই দরবার শরীফের পবিত্র আওলাদে পাককেন্দ্রিক। কিন্তু এ পরিমণ্ডলের বাইরে একজন দরবারী আশেক-ভক্ত হিসেবে নিবেদিত খাদেম হিসেবে, একনিষ্ঠ মুরিদ হিসেবে, সর্বোপরি দরবারের নির্বাচিত খলিফা হিসেবে দৃশ্যমানভাবে প্রায় পুরো কর্মময় জীবনকালটাই পরিপূর্ণ স্বচ্ছতা ও কঠোর-কঠিন দায়বদ্ধতার অবকাঠামোতে মাইজভাণ্ডারী দর্শনের আলোকে অভিবাহিত করার এক অবিস্মরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী ব্যক্তিত্ব সৈয়দ নুরুল বখতেয়ার শাহ।

১৬. বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি: মুক্তিযুদ্ধ, দেশীয় রাজনীতির পাশাপাশি বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি, বিশেষত ইসলামী বিশ্বের গতি প্রকৃতি তাঁকে ভাবিত করতো প্রায় প্রতিনিয়ত। এ ক্ষেত্রে তাঁর এক ঐতিহাসিক বিপ্লবী চিন্তার ফসল মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ প্রাঙ্গণে মর্যাদাপূর্ণভাবে ইরানের মহান বিপ্লবী নেতা আয়াতুল্লাহ রুহুল্লাহ খোমেনীর গায়েবানা জানাজার আয়োজন।

১৭. জীবনের যত অর্জন, সব গুলোকে একত্রিত করে সমগ্র সত্তা এবং মন-প্রাণ উজাড় করে দিয়ে শাহানশাহ সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীর রওজা শরীফ কমপ্লেক্সের পরিকল্পনা থেকে সফল বাস্তবায়নের অবিসংবাদিত অনুঘটক।

তাঁর সম্পর্কে সমকালীন বিশিষ্ট জনদের অভিমত: সৈয়দ নুরুল বখতেয়ার শাহ সম্পর্কে সমকালীন বিশিষ্টজনদের অনেকের একান্ত অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে বিভিন্নভাবে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: তাঁর নামাজে জানাযার ইমাম

মাওলানা শামসুল হুদা, ব্যরিষ্টার বজলুস সাত্তার, সফর উদ্দিন চিশতি, নুরুল হক আলকাদেরী, মফজল আহমদ নঈমী, যোয়াকিম রোজারিও, জ্যোতি পাল মহাথের, স্বামী গৌতমানন্দ, অমরজিৎ সিং, প্রফেসর ওয়াই এম জাফর, হাফেজ আবুল কালাম, গোলাম রসুল, সাংবাদিক মোঃ মাহবুব উল আলম, সৈয়দ নুরুল আতাহার আসিফ ও ড. সেলিম জাহাঙ্গীর।

গুরুত্বপূর্ণ সবগুলো অভিমত পর্যালোচনার পর আমার কাছে সর্বাধিক তাৎপর্যপূর্ণ ও প্রণিধানযোগ্য মনে হয়েছে সৈয়দ নুরুল বখতেয়ার শাহের পুত্র ও বক্তপুর দরবারের বর্তমান সাজ্জাদানসীন সৈয়দ নুরুল আতাহার আসিফের মন্তব্যটি: "ভাব-বিভোর তন্ময় অবস্থাকে লৌকিকতার আড়ালে ঢেকে স্বাভাবিক পার্থিব আচার-আচরণই ছিল তাঁর বড় কারামত।"

প্রতি বছর ৩ মাঘ এবং ৬ ভাদ্র বক্তপুর ভাণ্ডারে তাঁর পবিত্র খোশরোজ ও ওরশ শরীফ যথাযোগ্য মার্যাদায় উদযাপিত হয়। আশেক ভক্তের ব্যাপক অংশ গ্রহণে এ অনুষ্ঠান সমূহ পরিগণিত হয় সর্বজনীন মিলন তীর্থে। একই সাথে তদীয় মুর্শিদ শাহানশাহ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীর জাগতিক ও আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারী, একমাত্র পুত্র, গাউসিয়া হক মনজিলের সাজ্জাদানসীন সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান (ম.) এর উপস্থিতি, সার্বিক সহযোগিতা, সর্বোপরি সর্বাত্মক সহমর্মিতা অনুষ্ঠান মালাকে করে তোলে আরো আধ্যাত্মিক মহিমান্বিত।

সৈয়দ নুরুল বখতেয়ার শাহের দরবারী জীবনে এক ঐতিহাসিক যুগসন্ধিক্ষণ, চরম অগ্নিপরীক্ষা পর্ব ছিল তদীয় প্রথম জীবনের মুর্শিদ, পীর, অছিয়ে গাউসুল আ'যমের এক যুগান্তকারী কঠোর কঠিন সিদ্ধান্ত। তা হলো– অসিয়ে গাউসুল আ'যমের জীবদ্দশায় তাঁর সোহবত (সঙ্গ) এমনকি পীর মুরিদ সম্পর্ক ত্যাগ করে তদীয় পুত্রের স্বতন্ত্র আবাসস্থলে গিয়ে স্থায়ীভাবে অবস্থান এবং তাঁরই নেতৃত্বে থেকে তাঁরই মুরিদ হিসেবে খেদমতে আত্মনিবেদনের নির্দেশ। আধ্যাত্মিক লীলা খেলার এ কঠোর কঠিন সিদ্ধান্তে তথোধিক কঠিন যন্ত্রনাদায়ক মানসিক কষ্টের মধ্যে হৃদয়ের রক্তক্ষরণ চলাকালে একাধিকবার স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে সৈয়দ নুরুল বখতেয়ার শাহ বিনা প্রশ্নে অবনতচিত্তে এ সিদ্ধান্ত মেনে নিয়ে এবং সমগ্র সত্তা দিয়ে কথায়, কাজে ও চিন্তায় তা আজীবন পরিপূর্ণ বিশ্বস্ততার সাথে প্রতিপালন করে মাইজভাণ্ডারের ইতিহাসে পরিপূর্ণ আত্মনিবেদনের সংস্কৃতিতে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেলেন, যা রীতিমতো অনুকরণীয় ও অনুসরণীয় মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে ঐতিহাসিকভাবে। এ সব গুলো বিশেষত্বকে একত্রিত করে সবশেষে প্রায় জীবন সায়াহ্নে শাহানশাহ সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীর ওফাতের পর তাঁকে কেন্দ্র করে প্রায় অবিশ্বাস্য ও অকল্পনীয় বিশাল অংকের রওয়াজা শরীফের নান্দনিক পরিকল্পনা থেকে এর সফল সমাপ্তি পর্যন্ত প্রায় প্রতিটি মুহূর্ত, বখতেয়ার মামার মন প্রাণ উজাড় করে দেওয়া সার্বক্ষণিক নেপথ্যভূমিকা ছিল নন্দনকাননে ফুল ফুটানোর ক্ষেত্রে একইসাথে মাটির মমতা রস ও আত্মনিবেদিত মালির নিরবে নিভৃতে অন্যন্যসাধারণ ভূমিকার মতো; যা তাঁকে চিরস্মরণীয় করে রাখবে ইতিহাসের পাতায়; জাগতিক ও আধ্যাত্মিক উভয় পরিমন্ডলে চিরায়ত আশেক-ভক্তের হৃদয়ের মনিকোঠায়।

সূফি উদ্ধৃতি

■ যে পার্থিব গৃহকে ভেঙ্গে চুরে দিয়ে ভগ্নস্তুপের উপর পারলৌকিক সৌধ রচনা করে, আর পার্থিব মোহাবিষ্ট হয়ে পারলৌকিক সৌধ ভেঙ্গে তার উপর পার্থিব প্রাসাদ রচনায় নিয়োজিত হয় না, মূলতঃ সে লোকই হল প্রকৃত বুদ্ধিমান।

–হযরত হাসান বসরী (রাহ্)

■ যার আয়ু শুধু রূহ ও আত্মার উপর নির্ভরশীল, রূহ বা আত্মার বিদায় গ্রহণের সাথে সাথে তার আয়ু শেষ হয়– সে মৃত্যুবরণ করে কিন্তু যার আয়ু বা জীবন আল্লাহ তা'লার উপর নির্ভরশীল, তার কখনও মৃত্যু ঘটে না বরং সে অপ্রকৃত যিন্দেগী থেকে প্রকৃত যিন্দেগী অর্জন করে মাত্র।

–হযরত জুনায়েদ বাগদাদী (রাহ্)

ঈমান ও আখলাক ঃ পর্ব-১১

• সৈয়দ মুহাম্মদ ফখরুল আবেদীন রায়হান •

আখিরাত বা পরকাল চিরন্তন সত্য এবং অদৃশ্যে বিশ্বাস অপরিহার্য: ঈমান হচ্ছে (মুখের) স্বীকৃতি ও (অন্তরের) সত্যায়ন। শরীয়তের পরিভাষায় ঈমান হলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হতে যা নিয়ে এসেছেন সে গুলোতে বিশ্বাস স্থাপন করা। সুতরাং অদৃশ্যে ও আখিরাত বা পরকালে বিশ্বাস স্থাপন করা অপরিহার্য। আল্লাহ পাক কুরআনুল করীমে ইরশাদ করেন, "যারা অদৃশ্যে বিশ্বাস করে, নামাজ কায়েম করে ও তাদেরকে যে জীবিকা দান করেছি তার থেকে ব্যয় করে, এবং যারা আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে ও আপনার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে বিশ্বাস করে ও যারা পরকালে নিশ্চিত বিশ্বাসী, তারাই তাদের প্রতিপালকের নির্দেশিত পথে রয়েছে ও তারাই সফলকাম।" (সূরা বাকারা, আয়াত: ৩-৫) রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে পরকালের বিষয়াবলীর তথা যা আমাদের নিকট অদৃশ্য তৎসমুদয়ের খবর দিয়েছেন, সেগুলোর উপর নির্দ্বিধায় বিশ্বাস স্থাপন করা আবশ্যক। পরন্তু পরকাল বা আখিরাতের তুলনায় দুনিয়ার জগৎ একেবারেই তুচ্ছ ও নগন্য। আল্লাহ তায়ালা দুনিয়াকে কেবলমাত্র বান্দার জন্য পরীক্ষাকেন্দ্র বা শস্যক্ষেত্র রূপে সৃষ্টি করেছেন। মূলত: পরকালীন জীবনের সাফল্যই প্রকৃত সাফল্য এবং তা-ই চিরস্থায়ী। কিন্তু জাগতিক জীবন ক্ষণস্থায়ী। তাই রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, "দুনিয়া হল আখিরাতের শস্যক্ষেত্র।" পরকাল বা আখিরাতের মৌলিক বিষয়াবলী হল কবর বা বরযখ জীবন, হাশর, মিযান ও হিসাব নিকাশ, পুলছিরাত, হাউজে কাউছার, শাফায়াত, বেহেশত ও দোযখ।

কবর বা বরযখ জীবনের মাধ্যমে অনন্ত পরকালীন জীবনের শুরু। তবে এর পূর্বে মানুষ মৃত্যু বরণ করে, কিন্তু মৃত্যু দুনিয়ায় থাকাবস্থায় সংঘটিত হয় বিধায় একে আমরা পরকালীন জীবনের অর্ন্তভুক্ত না করে দুনিয়ার জিন্দেগীর শেষ পরিণতি হিসেবেই চিহ্নিত করার প্রয়াস পাই। আর মৃত্যু হল ইহকাল ও পরকালের সংযোগ সেতু। মৃত্যু পরবর্তী যে জীবন মহাপ্রলয় বা কিয়ামত পর্যন্ত মানুষকে অবশ্য অবশ্যই অতিবাহিত করতে হবে তা-ই হল কবর বা বরযখ জীবন। দৃশ্যত: যাদের কবরস্থ করা হয় না কিংবা যায়না তাদেরকেও বরযখ জীবনের স্বাদ ভোগ করতে হবে। তাই রাসূলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, "কবর হচ্ছে পরকালের প্রথম মঞ্জিল।" (বায়হাকী) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মৃত ব্যক্তিকে কবরের ভিতর রাখা হলে কবর তাকে বলে, হে বনী আদম কে তোমাকে আমার ব্যাপারে বিভ্রান্ত করে রেখেছিল? তুমি কি অবগত ছিলে না আমি পরীক্ষাগার, অন্ধকার গৃহ, নির্জন গৃহ, পোকা-পতঙ্গের গৃহ? কেন তুমি আমার ব্যাপারে ধোঁকায় নিমজ্জিত ছিলে, যখন তুমিই আমার ভিতর অনেককে রেখেছিলে? মৃত ব্যক্তি সৎকর্মশীল হলে তার পক্ষ হয়ে এক উত্তরদাতা কবরকে বলবে, তোমার জানা প্রয়োজন, সে সৎকর্মের আদেশ ও অসৎকর্মে নিষেধ করত। কবর বলবে তবে আমি তার জন্য সবুজ বাগিচায় রূপান্তরিত হচ্ছি। তখন মৃত ব্যক্তির দেহ নূরে পরিণত এবং তার রূহ আল্লাহর দরবারে নীত হবে। হাদীস শরীফে আছে মুর্দাকে যখন কবরে রাখা হয় তখন তার নিকট দুইজন ফেরেশতা আসেন। তাদের রং কালো কটা চক্ষু, তাদের আওয়াজ বজ্রধ্বনির মত ভয়ংকর এবং চোখের চাহনি চোখ ঝলসানো বিজলীর মত। তাদের দাঁত দিয়ে মাটি ফেড়ে ফেলবে। ১. প্রথমে তারা মুর্দার শিয়রের দিক দিয়ে প্রবেশ করলে নামাজ সেখানে হাজির হয়ে বলে উঠবে তোমরা আমার এই দিক দিয়ে এসোনা, কারণ সে দিবারাত্র অনেক নামাজ পড়েছে একমাত্র এই স্থানের বিপদ হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য। ২. তখন ফিরিশতাদ্বয় মুর্দার পায়ের দিক দিয়ে আসতে থাকবে। তখন উভয় পা বলবে তোমরা আমার দিকদিয়ে এসোনা। কারণ এই ব্যক্তি আমার উপর ভর দিয়ে হেঁটে হেঁটে জামাতের দিকে যেত এই স্থানের বিপদ হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য। ৩. ফিরিশতাদ্বয় পুনরায় মুর্দার ডানদিক দিয়ে আসলে সাদক্বা বলবে তোমরা আমার এই দিক হতে এসোনা কারণ সে এই স্থানের ভয় থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য সদকা করেছিল। ৪. অবশেষে ফিরিশতা দুইজন মুর্দার বামদিক হতে আসবে। এমন সময় তার রোজা বলে উঠবে হে ফিরিশতাদ্বয় তোমরা আমার দিক দিয়ে আসিও না। কেননা সে এই স্থানের ভয়েই অনেক রোজা রেখেছে, ক্ষুধা ও তৃষ্ণা ভোগ করেছে। তারপর তারা মুর্দাকে নিদ্রিত ব্যক্তির ন্যায় জাগিয়ে জিজ্ঞাসা করবেন, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্বন্ধে তোমার মত কী? সে বলবে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি নিশ্চয়ই তিনি আল্লাহর রাসূল। ইহা শুনে তারা বলবেন জীবিতাবস্থায় তুমি মুমিন ছিলে এবং মুমিনাবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছ। হযরত কাব বিন আযেব (রা.) বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে জনৈক আনসারীর জানাযায় গিয়েছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাথা ঝুঁকিয়ে তার কবরের পাশে বসে পড়েন। অতঃপর তিনবার বললেন, "হে আল্লাহ আমি আপনার নিকট কবর আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি।" তারপর বললেন, মোমিন যখন পরকালের দিকে যাত্রা করে, আল্লাহ তায়ালা তখন এমন একদল ফিরিশতা পাঠান যাদের চেহারা সূর্যের মত উজ্জ্বল। তাদের সাথে থাকে তার জন্য আনা সুগন্ধি ও কাফন। তারা তার মৃদু দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত বসে যায়। যখন রূহ বের হয়ে যায় তখন আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যকার এবং আকাশের সকল ফিরিশতা তার জন্য রহমত ও মার্জনার দোয়া করে। তার জন্য আসমানের দ্বার সমূহ খুলে দেওয়া হয়। প্রতিটি দরজাই চাইবে যেন এ মৃতের রূহ সে দিক দিয়ে প্রবেশ করানো হয়। যখন তার রূহ আল্লাহর দরবারে নীত হয় তখন এক ফিরিশতা বলেন, হে রব এ আপনার অমুক বান্দা। আল্লাহ বলেন, তাকে নিয়ে দেখাও, আমি তার জন্য কী নেয়ামত প্রস্তুত করে রেখেছি। কারণ আমি তার সাথে ওয়াদা দিয়েছি– "এ মাটি থেকে তোমাদের সৃষ্টি এবং এ মাটির মধ্যেই তোমাদের নিয়ে যাব"। (সূরা তোয়াহা, আয়াত ৫৫) প্রত্যাগমনকারীদের পা ফেলার শব্দ শুনতে পাচ্ছে কবরে এ অবস্থায় মৃতব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করা হয় হে ব্যক্তি তোমার রব কে? তোমার দ্বীন কী? তোমার নবী কে? সে বলে আমার রব আল্লাহ, আমার দ্বীন ইসলাম এবং আমার নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এ সময় জিজ্ঞাসাবাদকারী ফিরিশতাদ্বয় অত্যন্ত কঠোর ধমক দিয়ে প্রশ্ন করে এবং এটাই হচ্ছে মৃত ব্যক্তির শেষ পরীক্ষা। সে যখন উপরোক্ত জবাব প্রদান করে তখন এক ঘোষণাকারী ঘোষণা দেয়, তুমি সত্য বলেছ। বস্তুতঃ এ কথাই বলা হয়েছে এ পবিত্র আয়াতে, "মুমিনদের আল্লাহ দৃঢ়বাণী দ্বারা দৃঢ়তা দান করেন, (সূরা ইবরাহীম, আয়াত-২৭) হযরত আবু হোরায়রা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মুমিন তার কবরে একটি সবুজ বাগানে অবস্থান করে। তার কবর সত্তর গজ প্রশস্ত করে দেয়া হয়, এমনকি তা পূর্ণিমার পূর্ণ চাদের মত উজ্জ্বল হয়ে যায়। তোমরা কি জান এ আয়াতখানা কী বিষয়ে অবতীর্ণ হয়েছে? "নিঃসন্দেহে তার জন্য রয়েছে অত্যন্ত কঠিন ক্লিষ্ট জীবন" (সূরা তোয়াহা, আয়াত ১৩৪) সাহাবীরা বলেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'এ আয়াত কাফিরের কবর আযাব সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। কাফিরের উপর ৯৯টি বিষাক্ত সাপ লেলিয়ে দেয়া হবে। বলতে পার, সে সাপ কী রকম হবে? প্রতিটি সাপ হবে সাত মাথা বিশিষ্ট। অনুরূপ ৯৯টি সাপ কেয়ামত পর্যন্ত তাকে দংশন করে ক্ষত বিক্ষত করতে থাকবে, আর তার দেহের ভিতর (বিষাক্ত জ্বালাময়) নিঃশ্বাস ছাড়তে থাকবে।' গুনাহগার এবং কাফিরদের কবর আযাব এবং কবর সংকীর্ণ হয়ে যাওয়ার উপরেও বিশ্বাস রাখা অবশ্য কর্তব্য। ঈমানদার এবং নেককারদের কবরে বিভিন্ন রকম শান্তি ও আল্লাহর নিয়ামতসমূহ লাভের উপরও বিশ্বাস স্থাপন করা ওয়াজিব। এখন কেহ যদি এইরূপ প্রশ্ন উত্থাপন করে যে, যদি কোন ব্যক্তি আগুনে জ্বলে ভস্ম হয়ে যায় বা পানিতে ডুবে মরে বা কোন ব্যক্তিকে হিংস্র জন্তুতে একেবারে খেয়ে ফেলে, তাহলে মুনকার নকীর কিভাবে কোথায় বসে তাকে প্রশ্ন করবে? আর তার কবর আযাবই বা কিভাবে হবে? এই প্রশ্নের উত্তর হল, শরীরের বিভিন্ন অংশ বা সর্বশরীর বিভিন্ন অবস্থায় নষ্ট হয়ে গেলেও আল্লাহ তায়ালা আত্মাকে দুনিয়ায় পাঠিয়ে দিবেন এবং কার্যানুপাতে শান্তি বা শাস্তি প্রদান করবেন। যেমন কাফিরদের আত্মার উপর সকাল সন্ধ্যা দোযখের শাস্তি নাযিল হয়ে থাকে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কবর বেহেশতের বাগানসমূহের একটি বাগান অথবা দোযখের গর্তসমূহের একটি গর্ত। সুতরাং কবর সৎকর্মশীল মুমিনদের জন্য বেহেশতের বাগান রূপে সুশোভিত হবে এবং কাফির-মুনাফিকদের জন্য দোযখের অগ্নিকুন্ডলীর ন্যায় কঠোর শাস্তির স্থান হবে। কোনো কোনো পাপী মুমিনের জন্য ও কবরের আজাবের কথা দলিল প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্ত।

মহাপ্রলয় বা কিয়ামতের পরে দ্বিতীয় সিঙ্গার ফুঁকের মাধ্যমে মানব-দানব-সমগ্র সৃষ্টিরাজি পুনরুত্থিত হয়ে হাশর ময়দানে সমবেত হবে। হযরত আবু হোরায়রা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কিয়ামত দিবসে মানুষ তিন অবস্থায় হাশরের ময়দানে আগমন করবে, কেউ সওয়ার হয়ে, কেউ পায়ে হেঁটে এবং কেউ চেহারা দ্বারা হেঁটে। একজন জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! চেহারা দ্বারা কিভাবে হাঁটবে? তিনি বললেন, যে আল্লাহ পায়ের দ্বারা হাঁটাবার ক্ষমতা রাখেন, সেই আল্লাহ চেহারা দ্বারাও হাঁটাবার ক্ষমতা রাখেন। হযরত ইবনে ওমর (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সালালাহু আলাইহি ওয়াসালাম বলেছেন, যেদিন মানুষ আল্লাহর সম্মুখে হিসাবের কাঠগড়ায় দন্ডায়মান হবে, সেদিন অনেকেই স্বীয় ঘর্মে কান পর্যন্ত ডুবে যাবে। আবু হোরায়রা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, কেয়ামতে মানুষের দেহ থেকে অজস্র ঘর্ম যমীনের সত্তর গজ নীচ পর্যন্ত পৌছবে। (বুখারী, মুসলিম)

হযরত ওকবা ইবনে আমের (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সালালাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কেয়ামতের দিন সূর্য যমীনের কাছাকাছি অবস্থান করার ফলে মানুষ ঘর্মাক্ত হতে থাকবে। কারো ঘাম পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত, কারো অর্ধ হাঁটু, কারো হাঁটু, কারো উরু, কারো কোমর, কারো মুখ, কারো মাথা পর্যন্ত ঘামের মধ্যে ডুবে যাবে। হযরত আয়েশা (রা.) বললেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম– ইয়া রাসূলাল্লাহ! কিয়ামতের দিন কি কোন লোক সওয়ার হয়ে হাশর করবে? হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যা নবী এবং তাঁর পরিবার বর্গ, আর রজব এবং ক্রমাগত রমজান মাসের রোজাদারগণ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমরা মোটা এবং মাংসল জন্তু কুরবানী কর, কেননা কিয়ামতের দিন ইহা হবে পুলসিরাতে তোমাদের সওয়ারী জন্তু। হযরত নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেছেন, আমার উম্মতগণ কিয়ামতের দিন ১২০ কাতারে হাশর করবে। ইহাই অধিকতর সহীহ। চেহারা কপাল হাত-পা চাকচিক্যময় হবে, ইহা হবে মুমিনের পরিচয়। কাফিরদের পরিচয় হবে কালো চেহারা, তারা শয়তানদের সাথে আযাব ভোগ করতে থাকবে। হযরত নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন যে, আল্লাহ তায়ালা যখন হাশর ময়দানে সমস্ত মখলুককে একত্রিত করবেন, ১. তখন ঘোষণাকারী ঘোষণা করবেন আহলে ফজল (ফজিলত ওয়ালা বুজুর্গগণ) কে কোথায় আছে? ইহা শুনে একদল লোক দাঁড়াবে এবং দৌড়ে বেহেশতের দিকে চলবে। ফিরিশতাগণ তাঁদের সাথে সাক্ষাৎ করতঃ প্রশ্ন করবেন– আপনারা যে দৌড়ে বেহেশতের দিকে যাচ্ছেন আপনারা কারা? উত্তরে তাঁরা বলবেন, আমরা হলাম আহলে ফজল। ফিরিশতাগণ বলবেন আপনাদের সেই ফজল বা বুজুর্গী কী জিনিস? তারা বলবেন, যখন আমাদের প্রতি অত্যাচার করা হত তখন আমরা সবর করতাম এবং কেহ আমাদের প্রতি অসৎ ব্যবহার করলে আমরা তাকে মাফ করে দিতাম। ফিরিশতাগণ বলবেন, আপনারা বেহেশতে প্রবেশ করুন এবং সৎকর্মশীলদের পুরস্কার কতই না উত্তম। ২. তারপর ঘোষণাকারী ঘোষণা করবে কোথায় আহলে ছবর? তখন আরেক দল দাঁড়িয়ে দ্রুতবেগে বেহেশতের দিকে চলে যাবে। ফিরিশতাগণ তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বলবেন, আপনারা কেন বেহেশতের দিকে দৌড়ে যাচ্ছেন? তারা বলবেন আমরা আহলে ছবর। ফিরিশতাগণ বলবেন আপনাদের ছবর কোন ধরনের? তাঁরা বলবেন আমরা ধৈর্য ধরে আল্লাহর বন্দেগী করেছিলাম এবং ধৈর্য ধরে গুনাহ হতে পরহেজ করেছিলাম। ফিরিশতাগণ বলবেন, যান আপনারা বেহেশতে দাখিল হোন, নেক আমলকারীদের পুরস্কার কতই উত্তম বস্তু। ৩. অতঃপর ঘোষণাকারী ঘোষণা করবে কোথায় আল্লাহর ওয়াস্তে পরস্পর ভালোবাসাকারী? তখন আর একদল লোক দৌড়ে বেহেশতের দিকে যাবে। ফিরিশতাগণ তাদের সাথে সাক্ষাৎ করে বলবেন, আমরা আপনাদেরকে জান্নাতের দিকে দৌড়ে যেতে দেখছি। আপনারা কারা? উত্তরে বলবেন, আমরা আল্লাহর ওয়াস্তে একে অপরকে ভালোবাসতাম। ফিরিশতাগণ বলবেন পরস্পরের ভালোবাসা কোন ধরণের ছিল? তারা বলবেন আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য পরস্পরকে ভালবাসতাম। তখন ফিরিশতাগণ বলবেন, তা হলে আপনারা বেহেশতে প্রবেশ করুন। আমেলীনদের পুরস্কার কতইনা উৎকৃষ্ট। হযরত নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, উপরোক্ত লোক সকল বেহেশতে প্রবেশের পর মিজান (তুলাদণ্ড) হিসাবের জন্য দাঁড় করানো হবে। আহলে সুন্নতের বিশ্বাস, রোজ কিয়ামতে নেকী ও বদী ওজন করার জন্য মিযান বা দাঁড়িপাল্লা স্থাপন করা হবে। আল্লাহ বলেন, ইনছাফ বা ন্যায় নিষ্ঠার জন্যই আমি রোজ কিয়ামতে দাঁড়িপাল্লা রাখব। কারও প্রতি কোন বিষয়ে এতটুকু জুলুম করা হবে না । কারও সরিষা পরিমাণ নেকী থাকলেও তার প্রতিদান দেওয়া হবে। বান্দার নেকী-বদীর ওজনের দিক দিয়ে বান্দাকে মোট তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়। যেমন যাদের পাপের পাল্লা ভারী হবে তাদেরকে দোজখে নিক্ষেপ করা হবে। যাদের নেকীর পাল্লা ভারী হবে, তাদেরকে বেহেশতে পাঠিয়ে দেওয়া হবে, আর যাদের নেকী ও বদী সমান হবে, তাদেরকে আ'রাফ নামক স্থানে রাখা হবে। অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে বেহেশতে প্রবেশ করাবেন। প্রত্যেক বেহেশতী ব্যক্তির সাথে সত্তর হাজার পার্শ্বচর থাকবে। কাফির ও মুশরিকগণ বিনা হিসাবেই দোজখে যাবে। অদ্রুপ কোন কোন মুমিন ব্যক্তিও বিনা হিসাবেই বেহেশতে গমন করবে এবং কোন কোন মুমিনের সহজ হিসাব হবে। আবার অনেক মুমিনের হিসাব খুবই কড়াকড়ি হবে। অবশ্য আল্লাহ নিজের ইচ্ছা মতই তাদের কাউকে বেহেশতে প্রবেশ করাবেন এবং কাউকে প্রাথমিক পর্যায়ে দোজখে প্রবেশ করিয়ে কিছুদিন আগুনে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে পরে তাদেরকেও বেহেশতে প্রবেশ করাবেন। আর আমলনামা মুমিন বান্দাদের ডান হাতে এবং কাফেরদের বাম হাতে ও তাদের পশ্চাৎ দিক দিয়ে দেয়া হবে, তা সত্য। আমল নামা খুলে মানুষের কৃতকর্ম তার সামনে প্রকাশ করা হবে। সকল মানুষ নিজের আমল নামায় তার ভাল-মন্দ সকল কাজ দেখতে পাবে, আনুগত্য ও নাফরমানী দেখতে পাবে এবং তাদের সকল কাজ মিযানে ওজন দেয়া হবে। জাহান্নামের উপর পুলছিরাত স্থাপিত হবে। পুলছিরাত

সত্য। তা জাহান্নামের ওপরে একটি সুদীর্ঘ পুল। তা চুলের চেয়ে সরু এবং তরবারির চেয়েও অধিকতর ধারালো। জান্নাতীরা বিদ্যুৎ গতিতে তা অতিক্রম করবে। আর জাহান্নামীরা পা পিছলে এর তলদেশে পতিত হবে। আহলে সুন্নতের একটি সুদৃঢ় বিশ্বাস যে, রোজ হাশরে আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর একটি হাউজ হবে। ইহাই হাউজে কাউছার। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন, হে হাবীব, নিশ্চয়ই আমি আপনাকে কাউছার দান করেছি। (সূরা কাউছার, আয়াত-১) মুমিনগণ উহার পানি পান করবে। কাফিরগণ ইহা হতে বঞ্চিত থাকবে। বেহেশতে প্রবেশ করার পূর্বে এবং পুলছিরাত পার হওয়ার পর এই হাউজটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রাপ্ত হবেন। এই হাউজের পানি একবার পান করলে সে আর পিপাসার্ত হবেনা। এই হাউজের প্রস্থ একমাসের পথের সমান। ইহার পানি মধুর চেয়ে মিষ্টি ও দুধ অপেক্ষা সাদা। হাউজের পাশে উজ্জ্বল তারকার ন্যায় অগণিত পেয়ালা মজুদ থাকবে। হাউজটির সাথে দুইটি নল সংযুক্ত থাকবে। ঐ নল দিয়ে বেহেশতের কাউছার হতে হাউজে পানি আসবে। এর শাখা প্রশাখাগুলি হাশরের মাঠ পর্যন্ত পৌছবে। হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) বলেন, হুযুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আমার শাফায়াতে অবিশ্বাসী ও হাউজে কাউছারে অবিশ্বাসী, সে কিয়ামতের দিবস আমার শাফায়াত হতে বঞ্চিত থাকবে। আর যে হাউজে কাউছারের প্রতি অবিশ্বাস করবে, সে কিয়ামতে উক্ত হাউজের পানি পান করতে পারবে না। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আমার হাউজের দৈর্ঘ্য এক মাসের পথ। আর এর চতুষ্পার্শ্বের বাহুগুলো সমান। তার পানি দুধের চেয়ে সাদা এবং তার ঘ্রাণ মৃগনাভির সুগন্ধির চেয়ে অধিক সুগন্ধিময়। আর তার পেয়ালার সংখ্যা আকাশের তারকারাজির চেয়ে অধিক। একবার যে এ হাউজ থেকে পানি পান করবে, তার আর কখনো পিপাসা লাগবে না। এ মর্মে আরো অসংখ্য হাদীস রয়েছে।

হাশরের ময়দানে লেওয়ায়ে হামদের ঝান্ডা উত্তোলন করা হবে। এই ঝান্ডা আসমানসমূহের উপর রয়েছে। সেই লেওয়ায়ে হামদের পরিচয় ও উহার দৈর্ঘ্য প্রস্থ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, লেওয়ায়ে হামদের দৈর্ঘ্য এক হাজার বছরের দূরত্ব এবং উহার উপর "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ" লিখিত থাকবে এবং এর প্রস্থ আসমান যমীন এর মধ্যবর্তী ব্যবধান পরিমাপ। ইহার ফলা- লাল ইয়াকুতের এবং হাতল সাদা রূপা ও সবুজ পান্নার। এর তিনটি কেশ বন্ধনী থাকবে যা নূরের তৈরী। ১. একটি মাগরিবে, ২. অপরটি মাশরিকে, ৩. আর একটি পৃথিবীর মধ্যখানে, তাতে তিন লাইন লিখিত থাকবে। ১. প্রথম লাইনে "বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহিম", ২. দ্বিতীয় লাইনে "আল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আ'লামীন", ৩. তৃতীয় লাইনে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লিখিত রয়েছে। প্রত্যেক লাইনের দূরত্ব এক হাজার বছরের রাস্তা। লেওয়ায়ে হামদের নিকট আরও সত্তর হাজার কাতার করে ফেরেশতা রয়েছে, প্রত্যেক কাতারে পাঁচ লক্ষ ফিরিশতা আল্লাহর তসবীহ ও তসলিমে রত থাকবে কিয়ামত পর্যন্ত। ইমাম ইবনে আহমদ জুরজানী (র.) হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণী "লেওয়ায়ে হাম্‌দ আমার দুই হাতে থাকবে" ইহার অর্থ বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন যে, কিয়ামতের দিন যখন লেওয়ায়ে হাম্‌দ দাঁড় করানো হবে, তখন আদম (আ.) এর সময় হতে কিয়ামত পর্যন্ত সকল মুমিন লেওয়ায়ে হামদের চারদিকে থাকবেন এবং লেওয়ায়ে হাম্‌দ দণ্ডায়মান থাকা পর্যন্ত কাফিরগণ দোযখের পার্শ্বে থাকবে। আর যখন উঠিয়ে নেওয়া হবে তখন কাফিরগণকে দোযখের দিকে হাঁকিয়ে নেওয়া হবে। হযরত নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, সাত প্রকারের মানুষকে আল্লাহ তায়ালা আরশের নিচে কিয়ামতের দিন ছায়াদান করবেন যেদিন আরশের ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া থাকবে না। ১. ন্যায় বিচারক শাসক, ২. যেই যুবক আল্লাহর ইবাদতে থেকে বৃদ্ধ হয়েছে, ৩. সেই দুই জন লোক যারা একে অপরকে আল্লাহর ওয়াস্তে ভালোবসত এবং আল্লাহর ওয়াস্তে একত্রিত হত, আল্লাহর ওয়াস্তে পৃথক হয়ে যেত, ৪. যেই লোকের অন্তর সর্বদা মসজিদের সাথে সম্পৃক্ত থাকে, ৫. যেই লোককে কোন প্রভাবশালী ও সুন্দরী মেয়ে জেনার কর্মে আহ্বান জানালে সে স্পষ্ট বলে দেয় "আমি আল্লাহকে ভয় করি"। ৬. যেই লোক এমন গোপনে ছদকা করল যে তার ডান হাতে কী খরচ করেছে তা তার বাম হাত পর্যন্ত জানতে পারে না, ৭. যেই লোক খালেছভাবে আল্লাহর জিকিরে মগ্ন থাকে এমন সময় তার উভয় চক্ষু দিয়ে আল্লাহর ভয়ে অশ্রু ভেসে যায়। আল্লাহ আমাদেরকেও সেইসব দলে কবুল করুন, যাদের আল্লাহ আরশের ছায়া দান করবেন। আমিন।

তথ্যসূত্র: ১. আল কুরআনুল করীম, ২. আল ফিকহুল আকবর, ৩. শরহে আকাইদে নসফী, ৪. আত্ তিবরুল মাসবুক, ৫. শুনিয়াতুত তালেবীন, ৬. মুকাশাফাতুল কুলুব, ৭. দাকায়েকুল হাকায়েক।

মাজারকেন্দ্রিক ধর্মপ্রচার এবং ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশমান রূপ

• জাবেদ বিন আলম •

ইসলাম ধর্মের প্রচার, প্রসার এবং গতিময় বিকাশে আউলিয়া, দরবেশ এবং পীর-মাশায়েখদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা মানবজাতির ইতিহাসে স্বীকৃত অধ্যায় হয়ে আছে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (দ.) এরপর খোলাফায়ে রাশেদীনের সময় আর্থ-রাজনৈতিক-সামাজিক সাংস্কৃতিক ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি সাম্রাজ্য বিজয় ও নতুন নতুন ভূখন্ডের উপর রাজনৈতিক কর্তৃত্ব এবং নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ইসলাম ধর্মের রাজনৈতিক প্রসার ঘটে। দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (রা.) এর সময় ইসলামের মহান বাণী প্রচারের লক্ষ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন ভূখন্ডে বিভিন্ন সাহাবা আকরামের নেতৃত্বে প্রচারক দল ছড়িয়ে পড়লেও তাঁর ইন্তিকালের পর প্রশাসনের অভ্যন্তরীণ পরিচালনা কাঠামোতে আত্মীয় এবং গোত্রের আধিপত্য বিস্তার শুরু হলে ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনা ধীরে ধীরে নৈতিক পরিশুদ্ধিতা হারাতে শুরু করে। রাষ্ট্রব্যবস্থাপনায় সততা, ন্যায়নিষ্ঠা এবং নৈতিক মান রক্ষার চেয়ে ক্ষমতা ও প্রভাব প্রতিপত্তি প্রদর্শনে শাসকরা অধিকতর মনোযোগী হয়ে পড়েন। এর ফলে পারস্পরিক সন্দেহ, অবিশ্বাস এবং অনাস্থা বৃদ্ধি পেতে থাকে। কেউ কেউ রাষ্ট্রক্ষমতা দখল এবং নিয়ন্ত্রণে রাখার ঝগড়ায় সততা, মহানুভবতা এবং আত্মিক শুদ্ধতার চেয়ে অসি শক্তির উপর নির্ভরশীল হয়ে যান। সাম্রাজ্য বিস্তার এবং বিভিন্ন ভৌগোলিক এলাকার উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে প্রভূত ধন সম্পদের অধিকারীও হয়ে ওঠে মুসলিম জনগোষ্ঠী। ফলে অর্থ বিত্ত এবং সম্পদ অর্জন ও সঞ্চয়ের প্রবণতা একশ্রেণীর মুসলিমদেরকে লোভাতুর করে তোলে। ক্ষমতার লোভ, কর্তৃত্বের লোভ, আর্থ সম্পদের লোভে মুসলমানদের একটি অংশ আত্মিক শক্তি হারিয়ে বাহ্যিক কসরত এবং কুটিল চিন্তা-ভাবনা ও কর্মে জড়িয়ে পড়ে। তৎকালীন এই বৈষয়িক লোভ লোলুপতা এবং ইসলামী আদর্শের আলোকে অনৈতিক প্রবণতার বিরুদ্ধে শুদ্ধাচারী প্রতিরোধের সূচনা করেন হযরত আলী (রা.)। তাঁর এ ধরণের আন্দোলন অর্থ বিত্ত, ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি লোভীদের মনে শংকার উদ্রেক করে এবং এ পর্যায়ে ইসলাম ধর্মানুসারীদের মধ্যে বিভিন্ন মতের উদ্ভব ঘটে। কালক্রমে এ সকল ভিন্ন, মতাবলম্বীরা অন্তকলহ, দ্বন্দ্ব, বিরোধ, সংঘর্ষ ও রাজনৈতিক ক্ষমতা কেন্দ্রিক লড়াইয়ে লিপ্ত হয়ে পড়ে। এ ধরনের লড়াইয়ে নৈতিক শুদ্ধচারিতার প্রতীক পাক পঞ্জতনের অন্যতম হযরত ইমাম হোসেন (রা.) কারবালা প্রান্তরে নবী (দ.) এর উত্তরাধিকারী নবজাতক সহ শাহাদত বরণ করেন। এর পর রাজনৈতিক এবং সামরিক শক্তির উপর নির্ভর করে রাজ্য জয়ের মাধ্যমে ধর্ম বিস্তারের আর্তনাদ শত শতাব্দী ধরে শোকের মাতমে রূপান্তরিত হয়ে মুসলিম জনগোষ্ঠীকে নৈতিক শুদ্ধচারিতা অর্জনে উদ্বুদ্ধ করে তোলে। মূলতঃ তখন থেকেই ইসলাম ধর্মাচারীদের মধ্যে বেলায়তের প্রয়োজনীয় প্রভাব অত্যাবশ্যক হয়ে দাঁড়ায়। ইমাম হযরত জয়নুল আবেদীন (রা.) থেকে ইমাম হযরত জাফর সাদেক (রা.) হয়ে ইসলাম প্রচারের লক্ষ্যে আল্লাহর প্রেরণাদীপ্ত লক্ষ লক্ষ আত্মশুদ্ধ মহাপুরুষ মানবতার বাণী নিয়ে তাওহীদের নিশান উড়ানোর জন্য পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েন। তাঁদের অনেকেই মহানবী (দ.) কর্তৃক স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে ইসলাম প্রচার এবং আল্লাহর একত্ববাদ ঘোষণার জন্য নির্দিষ্ট এলাকায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। বৈষম্যহীন, নির্বিলাস জীবন যাপন, ন্যায়-সত্যনিষ্ঠ এবং পরার্থপরতা দেখে তাঁদের বাসগৃহে নিত্য নতুন মানুষের সমাগম ঘটতে থাকে। তাঁদের আচার-আচরণে বিমুগ্ধ হয়ে আগন্তুকরা দ্রুত ইসলাম ধর্ম গ্রহণ এবং তাওহীদ প্রচারে তৎপর হয়ে ওঠেন। এক পর্যায়ে ইসলাম ধর্মের দাওয়াত প্রদানকারী সংশ্লিষ্ট মহান অলি-আল্লাহর ওফাত ঘটলে সেখানে গড়ে ওঠে মাজার বা স্মৃতিবাহি। তাঁর (সংশ্লিষ্ট আওলিয়ার) দর্শন লাভের মাধ্যমে এবং চরিত্র-মাধুর্যে প্রভাবিত হয়ে যারা তখন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন তাঁরা তাঁকে মুর্শিদ বা পথ প্রদর্শক হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তাঁরা তাঁদের মুর্শিদের কার্যাবলী এবং তওহীদ প্রচারের নীতিমালাকে স্মরণীয় করে রাখার উদ্দেশ্যে মাজার ঘিরে গড়ে তুলেন নানা রকমের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান। মুসলিম জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এভাবে গড়ে ওঠে মাজার কেন্দ্রিক ইসলাম ধর্ম প্রচার কেন্দ্র, সভ্যতা এবং সংস্কৃতি।

ধর্ম সম্পর্কে জ্ঞান রাখা আলেম সমাজ তাঁদের নানা রকম বয়ানে প্রায়শঃ বলে থাকেন, "মদীনা কা রওজা জান্নাতকা নক্শা।" নবীজী (দ.) এর রওজা শরীফকে চিরন্তন শান্তি প্রবাহ জান্নাতের সঙ্গে তুলনা করা হয়ে থাকে। মহান আল্লাহ প্রেরিত সব নবী (আ.) ও রাসূল (দ.) দের মধ্যে সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ হচ্ছেন হযরত মুহাম্মদ (দ.)। আমরা তাঁর নিকটই মহান আল্লাহর সুমহান অস্তিত্বের বিষয়ে নিশ্চিতভাবে জানতে পেরেছি। মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পবিত্র বাণী তাঁর পবিত্র জবানেই সৃষ্টি কুলের নিকট বিবৃত হয়েছে। তাঁর প্রতিটি কথাই আল্লাহর বাণীর মতোই পবিত্র হয়ে তাঁর অনুগামী অনুসারীদের জন্য অনুশীলনের ঘোষণা এসেছে। পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণের মাধ্যমে মহান বন্ধুর সঙ্গে পবিত্রতম মহা মিলন 'রাফিকুল আলা' সম্পন্ন হবার পর তাঁকে তাঁর পবিত্র হুজরায় শায়িত রাখা হয়েছে। সেখানে তাঁর অবস্থানের কারণেই মদীনা নগর মদীনা শরীফের মর্যাদা অর্জন করেছে। পবিত্র হজ্ব পালনে গমনকারীদের তাই কবি নজরুলের ভাষায়, 'কাবার জিয়ারতে যাব মদীনায়' পালন করতে হয়। কাবা শরীফ মানবজাতির আদি ক্বিবলা। ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের জন্যই মহান আল্লাহর তরফ থেকে তাওহীদের শাশ্বত রশ্মিধারা অবগাহনের সুবিধার্থে মদীনা শরীফকে নতুন কেন্দ্র হিসেবে সুউচ্চ মর্যাদায় সমাসীন রাখা হয়েছে। 'মক্কা-মদীনা' মুসলিম উম্মাহর নিকট যুগবদ্ধ একক শব্দ। এ অবিচ্ছিন্নতার মূলে রয়েছে তওহীদ। মহান আল্লাহ অদৃশ্যমান, তিনি তাঁর পয়গাম পাঠিয়েছেন মানব জাতির জন্য মানুষ আকৃতির মধ্যমে, যাতে মানব জাতির নিকট সহজভাবে তা গ্রহণযোগ্য হয়। মানব জাতির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং পরম সৌন্দর্য ও লাবণ্যময় আকৃতির অধিকারী হযরত মুহাম্মদ (দ.)। তিনি কর্মময় গৌরবদীপ্ত সৌন্দর্যেরও অধিকারী। তিনি নিজেই নিজের তুলনা। তাঁর অতুলনীয়তাকে অবিস্মরণীয় করে রাখার তাগিদ তো আল্লাহ পাকই দিয়েছেন। আর সে কারণেই নবী-রাসূলগণের মধ্যে বিশ্ব ব্রহ্মান্ডে হযরত মুহাম্মদ (দ.) এর রওজা মোবারকই মানবজাতির নিকট সবচেয়ে বেশী উদ্ভাসিত হয়েছে। পরিণত হয়েছে মানব জাতির জন্য পরিপূর্ণ মানবতাবোধ শিক্ষার প্রাণ কেন্দ্রে। মুসলিম জনগোষ্ঠী এখানে এসে ঐশী তৃপ্তিলাভ করেন এবং সমগ্র মানবজাতি মদীনা শরীফ থেকেই 'মদীনা সনদ' অনুযায়ী মানবতার দীক্ষা অর্জনে চিরন্তন বিশ্বকোষের সন্ধান পেয়ে থাকেন। ফলে বিশ্ব ব্রহ্মান্ডে মদীনা শরীফের 'রওজা পাক' হচ্ছে সকল সৃষ্টি জগতের জন্য একটি চির জাগ্রত অবিনশ্বর জ্যোতি বিকিরণ কেন্দ্র।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পৃথিবীর বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে সহজ সরল সঠিক পথে আহ্বান জানানোর লক্ষ্যে বিভিন্ন জনপদে তাঁর প্রতিনিধি নবী (আ.) এবং রসূল (দ.) দের রহমতের ধারা হিসেবে প্রেরণ করেছেন। নির্ধারিত স্ব স্ব জনপদে প্রেরিত নবী রসূলগণ আল্লাহর বাণী প্রচার সম্পন্ন করে গেলেও তাঁদের ওফাতের পর সকলের রওজা গড়ে ওঠেনি এবং সন্ধানও পাওয়া যায়নি। সকলের মাজার বা রওজার সন্ধান না পাওয়ায় মানব সভ্যতার বিকাশে স্থায়ী পাথেয় ধরে রাখা বিভিন্ন সময় অসম্ভব হয়েছে। অর্থ-বিত্ত-সম্পদের প্রাচুর্য এবং রাজ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিতরা এক সময় দুষ্ট দানবীয় দাম্ভিকতায় মানবজাতির উপর কর্তৃত্ব প্রদর্শন করতে গিয়ে 'নিজেকেই স্রষ্টা' সম দাবী করে মানুষকে পথ ভ্রষ্টতা অনুশীলনে বাধ্য করেছে। এমতাবস্থায় মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মানব জাতিকে শুদ্ধপথে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে মানব জাতির মধ্য থেকে নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। অত্যাচারী, নির্যাতক এবং দুর্বৃত্তচারী শাসকের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেই নবী রসূলগণ আল্লাহর আনুগত্য অর্জন এবং মানবিক সমতা প্রতিষ্ঠার জন্য বারবার আহ্বান জানিয়েছেন। কিন্তু লিখিত কোন গ্রন্থে তা অবশিষ্ট না থাকায় ভাঙ্গা গড়ার এ পৃথিবীতে তাঁদের সকল কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে মানবজাতি অবহিত হবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। পৃথিবীর ভূমন্ডলে প্রাকৃতিক বিবর্তনের কারণে অনেক নবী রসূলের রওজার অবস্থান সম্পর্কে সন্ধান লাভকরা মানব গোষ্ঠীর নিকট অসম্ভব থেকেছে। ফলে মানব সভ্যতার গতিময় বিকাশ বার বার অবরুদ্ধ থেকেছে। অথচ প্রত্যেক জনগোষ্ঠীর নবী রসূলদের মাজারের ঠিকানা স্থিত থাকলে প্রতিটি জনগোষ্ঠীর মধ্যে হেদায়তের চেরাগ অনেক বেশী প্রজ্বলিত থাকত এবং মানবতাবোধ দ্রুত বিকশিত হতো। কারণ, প্রতিটি মাজারের ঠিকানায় মানব সভ্যতার দিশারীদের কর্মকান্ডেরও বিবরণী থাকত যা থেকে মানুষ সহজেই জ্ঞান অনুশীলনের সুযোগ পেত।

মাজার শরীফ গুলোকে কেন্দ্র করে বার্ষিক ওরশ সম্পন্ন হয়। ওরশে ব্যাপক জনসমাবেশ ঘটে। কোন কোন ওরশ অনুষ্ঠানে

লক্ষ লক্ষ মানুষের উপস্থিতিতে আল্লাহ আল্লাহ রবে ঐশী উন্মত্ততার সৃষ্টি হয়। সাধারণত মাজারে শায়িত অলি-দরবেশদের পবিত্র জন্ম দিন অথবা ওফাত বার্ষিকীতে ওরশ অনুষ্ঠানগুলো সম্পন্ন হয়। অলি-দরবেশদের জন্ম এবং ওফাতের তারিখগুলোতে মাজার প্রাঙ্গণে সমবেত ভক্ত, অনুরক্ত, জায়েরীন, আশেকিন, তামাশগীরের উপস্থিতিতে সামাজিকভাবে যে ঐশী জলসার সৃষ্টি হয়, সে সম্পর্কে দেশবাসী ও এলাকার জনগণ ব্যাপকভাবে অবহিত থাকে। শুধু ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা নন, অন্য ধর্মাচারে বিশ্বাসীরাও অবহিত হন যে এখানে মাজার ঘিরে ইসলাম ধর্মের প্রচার অনুষ্ঠান এবং মহান আল্লাহ, তাঁর রসূল (দ.) এবং সংশ্লিষ্ট অলি দরবেশের প্রশংসা এবং গুণকীর্তন চলছে। মানুষকে তাঁদের পথ ও পাথেয় অনুসরণের আহ্বান জানানো হচ্ছে যাতে সৎ-সহজ-সরল এবং পুণ্যপথে জীবন জীবিকা নির্বাহ করা যায়। যোগাযোগ ও যাতায়তের দুরত্ব আর্থিক অসমর্থতা, শারিরীক দুর্বলতা, অসুস্থতা প্রভৃতি কারণে অনেকের পক্ষে রিয়াজুল জান্নাত নবীজী (দ.) এর রওজা শরীফ জিয়ারত করা সম্ভব হয়ে ওঠেনা। এ ধরনের অসমর্থ অভাবগ্রস্থ মানুষ নিকটস্থ অলি দরবেশের মাজারে উপস্থিত হয়ে নবীজী (দ.) সমীপে দরুদ ও সালাম পেশ করার সৌভাগ্য অর্জন করে থাকেন। কারণ, অলি দরবেশরা হচ্ছেন আল্লাহর পরম বন্ধু এবং নায়েবে রসুল (দ.)। এ বিশ্বাস থেকেই সাধারণ মানুষ মাজারে উপস্থিত হয়ে আত্মিক প্রশান্তি এবং ঈমানি দৃঢ়তা অনুভব করেন।

পার্থিব জগতে মানুষকে কর্ম এবং শ্রম বিনিয়োগের মাধ্যমেই জীবিকা নির্বাহ করতে হয়। বড় বড় মাজার সমূহে খাদেম, দাপ্তরিক, গৃহস্থালী প্রভৃতি কর্ম সম্পন্নের জন্য লোক নিয়োগ করা হয়। এ সকল মাজারে পারিবারিক অংশ নামা ভেদে লোক নিয়োগের সংখ্যার হার নির্ভর করে। এ সকল কর্মচারীদের বেশীর ভাগই বেতনভুক এবং প্রাসঙ্গিক সুবিধাদি ভোগ করে থাকে। এ সমস্ত কর্মচারীরা জীবন ধারণ, ধর্ম প্রচার এবং ব্যক্তিগতভাবে সৎজীবন যাপনে উদ্বুদ্ধ হয়ে থাকে। মাজার ঘিরে গড়ে ওঠে শহুরে পরিবেশ। প্রতি নিয়ত জনসমাগম ঘটার কারণে এখানে দোকান পাট ব্যবসা বাণিজ্যও গড়ে ওঠে। বাৎসরিক ওরশে মেলা বসে বিস্তীর্ন এলাকায়। মেলায় বেচাকেনা হয় প্রচুর লোকজ পণ্য সামগ্রী। মাজার ঘিরে অনেক অসহায় ভবঘুরে, উন্মাদ, জীর্ণ শীর্ণ বেকার নারী পুরুষ আশ্রয় পায়, পালিত হয়। বিভিন্ন এলাকা এবং দেশ বিদেশের মানুষের সমাগম ও অবস্থানের কারণে গড়ে ওঠে কসমো কালচার। আর অনবরত চলে আল্লাহর জিকির। বড় বড় মাজারকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠেছে মাদ্রাসা, মকতব, স্কুল সহ নানা রকম শিক্ষা, বাণিজ্যিক এবং সেবা প্রতিষ্ঠান। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে মুসলিম জনগোষ্ঠীর জন্য গড়ে ওঠা মসজিদ নিয়ম শৃঙ্খলা অনুযায়ী নামাজের সময় খোলা থাকে, অন্যদিকে মাজার সমূহ খোলা থাকে হর ওয়াক্তে। সম্প্রতি আফ্রিকার দেশ মালিতে ইসলাম ধর্মানুসারী নামধারী কতিপয় উগ্রপন্থী গোষ্ঠী রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করে হুজুর (দ.) এর সময়ে ইসলাম প্রচার কাজে গমনকারী কয়েকজন বিশিষ্ট সাহাবা আকরাম (রা.) এর মাজার শরীফ ধুলিস্মাত করে দেয়। ইসলাম প্রচারের স্থানিকতা এবং নান্দনিকতা সম্পর্কে ধারণাহীন এই সকল উগ্রবাদীরা ঐতিহ্যবাহী এবং তওহীদের কেন্দ্র হিসেবে পরিচয় বহনকারী মাজার সমূহ ভেঙ্গে ফেলার পরিপ্রেক্ষিতে সাধারণ মানুষের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। উগ্রবাদীদের প্রতিরোধে সক্ষম না হলেও সাধারণ মানুষ তাঁদের তওহীদ প্রচারের ঠিকানা বিধ্বস্ত হওয়ায় কান্নাকাটিতে বুক ভাসিয়ে আল্লাহর নিকট ফরিয়াদ পেশ করেন। মালির এ সমস্ত মাজার সমূহ অসংখ্য সাহাবা (রা.) এবং অলি দরবেশের শুধু ঠিকানা নয় বরং সে জাতির পুরাকীর্তি হিসেবেও মর্যাদা প্রাপ্ত ছিল। মহান স্রষ্টা আল্লাহ রহমানুর রহিম তাঁর প্রিয় বান্দাদের প্রতি অসম্মান ও অবজ্ঞা প্রদর্শনকে গ্রহণ করেন নি। তিনি তাঁর পরম বন্ধুদের প্রতি অপমান জনক আচরণ বিষয়ে মজলুম মানুষের ফরিয়াদকেই কবুল করেছেন। স্বল্পতম সময়ে মালিতে উগ্রপন্থীরা চরম প্রতিরোধের মুখে পতিত হয়ে এখন পলায়নপর অবস্থায় আছে। কারণ আল্লাহর অলিদের মৃত বলতে নেই। তাঁরা আল্লাহর রোশনীতে উদ্ভাসিত এবং চির জাগ্রত। স্বয়ং আল্লাহ তাঁর অলি দরবেশদের জিম্মাদার ও হেফাজতকারী। আত্মীয় স্বজনের মায়া মমতা পরিত্যাগ করে যে সকল সাহাবা (রা.) আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের নিমিত্তে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে তওহীদ প্রচারের জন্য ছুটে গিয়েছেন হাজার বছর পরেও তাঁদের প্রতি কোন প্রকার অসম্মান আল্লাহ বরদাশত করেন না। আফ্রিকার দেশ মালি এ ঘটনার অতি সাম্প্রতিক উদাহরণ।

গাজায় ইসরাইলের গণহত্যামিশন 'অপারেশন প্রটেক্টিভ এজ' ও মুসলিম দুনিয়ার নির্লিপ্ততা প্রসঙ্গ

• আবসার মাহফুজ •

আবার ইহুদীবাদী রাষ্ট্র ইসরাইলের বর্বর আগ্রাসন, হামলা ও গণহত্যার শিকার হয়েছে ফিলিস্তিনীরা। গত ৮ জুলাই থেকে টানা কয়েকদিনের হামলায় তিন শতাধিক ফিলিস্তিনী নিহত হয়েছে, যাদের মধ্যে রয়েছে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারী ও শিশু। আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের হিসাব অনুযায়ী নিহতদের ৩০ ভাগই নারী ও শিশু। আহতের সংখ্যা হাজার ছাড়িয়ে গেছে। অসংখ্য টার্গেটে হামলা পরিচালনা করা হয়েছে। এ সব হামলায় মানুষ হতাহত হওয়া ছাড়াও বাড়িঘর, স্থাপনা, সহায়-সম্পদ ধ্বংস হয়েছে। বিমান হামলার পাশাপাশি বর্বর কায়দায় স্থল অভিযান শুরু করায় হতাহতের সংখ্যা বাড়ছে লাফিয়ে লাফিয়ে। ইসরাইলের এই পাশবিক হামলার বিরুদ্ধে এখনও কোনো জোরালো প্রতিবাদ ও বাধা আসেনি মুসলিম দুনিয়া এবং আন্তর্জাতিক মহল থেকে। এতে ইসরাইল আরও বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। ডেইলি সাবাহ বলেছে, গাজা হামলায় আন্তর্জাতিকভাবে নিষিদ্ধ রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহার করছে ইসরাইল। ফিলিস্তিনের মেডিকেল ও মানবাধিকার কর্মীদের সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে বলে পত্রিকাটি উল্লেখ করেছে। আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের খবরে দেখা যাচ্ছে, ইসরাইলের হামলায় আক্রান্ত ফিলিস্তিনিদের শরীর পুড়ে যাচ্ছে। আক্রান্তদের শরীরের বিভিন্ন অংশ টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলে দিতে হচ্ছে। আক্রান্তদের ওপর প্রাথমিক পরীক্ষা চালিয়ে অস্ত্রের প্রকৃতি অত্যন্ত লোমহর্ষক বলে জানিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। প্রসঙ্গত, ইসরাইল এর আগে গাজা আক্রমণে দুবার আন্তর্জাতিকভাবে নিষিদ্ধ অস্ত্র ব্যবহার করেছিল। সেই একই অস্ত্র এখন ব্যবহার করছে। ফিলিস্তিনি ডাক্তাররা বলছেন, রাসায়নিক প্রতিক্রিয়ায় অনেকেই তাদের অঙ্গ হারাতে বসেছেন। এই হামলায় আন্তর্জাতিকভাবে নিষিদ্ধ অস্ত্র ব্যবহার হয়েছে বলে মনে করছেন তারা। এদিকে জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি মুন বলেন, গাজা পরিস্থিতি অত্যন্ত ভয়াবহ পর্যায়ে গেছে। মধ্যপ্রাচ্য কঠিন সময় পার করছে এখন। ৯ জুলাই রাতে ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু, ফিলিস্তিন প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস, মিসরের প্রেসিডেন্ট আবদেল ফাত্তাহ আল সিসি ও মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী জন কেরির সঙ্গে বৈঠকে এ কথা বলেন তিনি। মুন বলেন, গাজায় নতুন করে সহিংসতা বৃদ্ধি পাওয়ায় আমি অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত। সাম্প্রতিককালে এ অঞ্চলটি চরম দুঃসময় মোকাবিলা করছে। তিনি আরও বলেন, গাজা পরিস্থিতি যে কোনো সময় নিয়ন্ত্রণের বাইরে যেতে পারে। এ সময় ইসরাইলের রকেট হামলার নিন্দা জানিয়ে তিনি বলেন, এ ধরনের হামলা অগ্রহণযোগ্য তা অবশ্যই বন্ধ করতে হবে।

আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, ফিলিস্তিনি যোদ্ধাদের বিরুদ্ধে রকেট হামলার অভিযোগ এনে গাজা উপত্যকায় নির্বিচার বিমান হামলা অব্যাহত রেখেছে ইসরাইল। কথিত 'জঙ্গিদের' বিরুদ্ধে এবং নিজেদের 'নিরাপত্তার' জন্য বিমান হামলা পরিচালিত হচ্ছে বলে ইসরাইল দাবি করলেও যারা নিহত হচ্ছেন তাদের প্রায় সবাই বেসামরিক নাগরিক। এসব হামলার সাথে তাদের বিন্দুমাত্র সংশ্লিষ্টতা নেই। গাজায় বিমান ও স্থল হামলা শুরু করার পর নিহতের সংখ্যা এ পর্যন্ত তিনশ' ছাড়িয়ে গেছে। বহুসংখ্যক বহুতল বাড়িঘর ধুলোর সাথে মিশে গেছে। হামলা বন্ধে আন্তর্জাতিক চাপ সত্ত্বেও (যদিও জোরালো চাপ নেই) ইসরাইল ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে বলেছে গাজায় হামলা বন্ধ হবে না। আরও বাড়বে। বদলা হত্যার জেরে শুরু হওয়া গাজা অভিযান চলবে। আক্রমণ আরও বিস্তৃত হবে। ১০ জুলাই অপারেশন প্রটেক্টিভ এজ'র তৃতীয় দিনে নিরাপত্তা কেবিনেটের সংক্ষিপ্ত বৈঠকে এমন মন্তব্য করেছেন ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। তিনি বলেন, হামলার যেমন পরিকল্পনা হয়েছিল তা বাস্তবায়ন হয়েছে। হামলার পরবর্তী ধাপগুলোতে আক্রমণ আরও বাড়বে। নেতানিয়াহু আরও বলেন, গাজা থেকে সন্ত্রাসীদের (তাঁর ভাষায়) রকেট হামলা আমরা আয়রন ডোম প্রযুক্তিতে ঠেকিয়ে দিয়েছি। এ সময় গাজায় স্থল বাহিনী পাঠানোরও ইঙ্গিত দেন তিনি। এই পরিস্থিতিতে যখন গাজার সাধারণ নাগরিকদের জীবন চরম হুমকির মুখে পড়েছে তখন সেখানে ইসরাইল স্থল অভিযান শুরু করে। একটানা এক সপ্তাহ ধরে নৃশংস বিমান হামলা চালানোর পর গত ১৩ জুলাই ভোররাত থেকে আগ্রাসী ইসরাইলি বাহিনী ফিলিস্তিনি ভূখণ্ড গাজায় ভয়াবহ স্থল হামলা শুরু করেছে। এই বর্বর আগ্রাসী বাহিনী গাজার উত্তর এলাকার কয়েকটি লক্ষ্যস্থলে প্রথম অভিযান শুরু করে। নৃশংস এই স্থল অভিযানের পাশাপাশি ইসরাইলের বিমান

হামলাও আগের মতোই অব্যাহত রয়েছে। ইহুদি বাহিনীর স্থল অভিযানের ভয়ে ভীত ফিলিস্তিনিরা দলে দলে তাদের বাড়িঘর ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে। জাতিসংঘ থেকে বলা হয়েছে, ফিলিস্তিনি উদ্বাস্তুদের আশ্রয় দেয়ার জন্য চালু করা তাদের কয়েকটি আশ্রয়কেন্দ্রে হাজার হাজার ফিলিস্তিনি অবস্থান নিয়েছে। জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানানোর পরও বিমান হামলা অব্যাহত রাখার পাশাপাশি স্থল হামলা চালালো ইসরাইল। ফিলিস্তিনের ইসলামি প্রতিরোধ আন্দোলন হামাস হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছে, গাজা উপত্যকায় বর্বর আগ্রাসনের জন্য ইহুদিবাদী ইসরাইলকে চরম মূল্য দিতে হবে। এর আগে ফিলিস্তিনি প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস আশংকা প্রকাশ করে বলেছিলেন, গাজায় ইসরাইলের স্থল অভিযান মাত্র কয়েক ঘণ্টা দূরে। ইসরাইলি সেনারা যেকোন মুহূর্তে গাজায় ঢুকে পড়ার প্রস্তুতি নিয়ে ফেলেছে। শেষ পর্যন্ত মাহমুদ আব্বাসের আশঙ্কাই সত্যি হয়েছে। স্থল অভিযান জোরদার হওয়ার পর গাজায় ভয়াবহ মানবিক বিপর্যয় দেখা দিয়েছে। আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, ইসরাইলের বর্বর হামলায় গাজায় ভয়াবহ মানবিক বিপর্যয় দেখা দিয়েছে। অব্যাহত হামলায় পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। তীব্র হামলার কারণে সেখানে পানির সরবরাহ বন্ধ করে দিয়েছে আন্তর্জাতিক মানবিক সংস্থা অক্সফাম। ৯০ শতাংশ পানিই সেখানে এখন অনিরাপদ। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ব্যক্তিদের অবস্থাও অবর্ণনীয়। অক্সফাম জানিয়েছে, তাদের হাসপাতালের জ্বালানি কয়েক দিনের মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে। এরপর অপারেশন করাও আর সম্ভব হবে না। এ দিকে হামলা থেকে জীবন রক্ষা করতে হাজার হাজার ফিলিস্তিনি উত্তর গাজা ছেড়ে যাচ্ছেন। নিরাপত্তার জন্য জাতিসঙ্ঘের আশ্রয় শিবিরের দারস্থ হচ্ছেন তারা। আন্তর্জাতিক মানবিক সংস্থা অক্সফাম বলছে, তারা গাজায় ব্যাপক হতাহতের প্রেক্ষাপটে মানবিক বিপর্যয়ের ক্রমবর্ধমান অবনতিশীল অবস্থা মোকাবেলার চেষ্টা করে যাচ্ছে। অধিকৃত ফিলিস্তিনি অঞ্চল ও ইসরাইলে অক্সফামের কান্ট্রি পরিচালক নিশান্ত পান্ডে বলেছেন, ইসরাইলের বিমান হামলায় গাজার পানি ও পয়ঃপ্রণালী ধ্বংস অথবা মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তিনি বলেন, এসব সঙ্কট মোকাবেলা ও নিরাপত্তাহীনতা লোকদের কাছে সাহায্য পাঠানো কঠিন করে তুলেছে। লড়াইয়ের কারণে অক্সফাম গাজায় তাদের বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ বন্ধ করে দিয়েছে। ইসরাইলি বিমান হামলায় বিচ রিফিউজি ক্যাম্পের সরবরাহ লাইন ধ্বংস ও দুইটি পানির কূপ ধ্বংস হয়েছে। এতে প্রায় এক লাখ লোকের পানি সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেছে। অক্সফামের হাসপাতালে আহতদের প্রায় ৫০ শতাংশের চিকিৎসা দেয়া হচ্ছে। তাদের হাসপাতালের জ্বালানি কয়েক দিনের মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে বলে জানিয়েছে। এর ফলে জীবনরক্ষাকারী অপারেশন করা অসম্ভব হয়ে পড়বে। গালফ নিউজকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে গাজা উপত্যকার ইমার্জেন্সি মেডিক্যাল সার্ভিসের প্রধান ডা. বাশার মুরাদ বলেন, গাজায় বসবাসকারী ফিলিস্তিনিদের মনস্তাত্ত্বিক ক্ষতি হয়েছে ভয়াবহ। তিনি বলেন, 'গাজায় যা ঘটছে, তা নিশ্চিতভাবেই হলোকাস্ট। ফিলিস্তিনি শিশুরা ২৪ ঘণ্টা আতঙ্কে থাকে। তারা বিস্ফোরণের শব্দে জেগে ওঠে। অনেককে সারা জীবন মানসিক সমস্যায় কাটাতে হতে পারে।' জাতিসংঘ রিপোর্ট অনুযায়ী, দু'পক্ষের সংঘর্ষ শুরুর পর অন্তত ৭০ হাজার মানুষ গাজা ছেড়ে অন্যত্র চলে গেছে। সংঘর্ষে আহত হয়েছে অন্তত ১,২৮০ জন। গাজাভিত্তিক একটি মানবাধিকার সংগঠন এর মতে, গাজার দুই সহস্রাধিক বাড়িঘর ইসরাইলের হামলায় বিধ্বস্ত হয়েছে।

ইসরাইল বাহিনী স্থল অভিযান শুরুর প্রেক্ষাপটে সৈন্য অপহরণের হুমকি দিয়েছে ইসলামী প্রতিরোধ আন্দোলন হামাস। হামাসের মুখপাত্র ফাওজেহ রারহুম বলেছেন, 'স্থল অভিযান শুরুর মধ্য দিয়ে ইসরাইলের সৈন্য অপহরণের পথটা আরও সহজ হয়েছে।' তিনি বলেন, 'তারা স্থলযুদ্ধ শুরু করার পর তাদের অনেক সৈন্যকে অপহরণ করার পথ সহজ হবে। এর মাধ্যমে আটককৃত ফিলিস্তিনিদের মুক্ত করা হবে। যেমনটি অতীতে হয়েছিল।' ২০০৬ খ্রিস্টাব্দে ইসরাইলির সৈন্য গিলাদ শালিতকে অপহরণ করে পাঁচ বছর পর ২০১১ খ্রিস্টাব্দে এক হাজার ফিলিস্তিনি বন্দিমুক্তির বিনিময়ে ছেড়ে দেয় হামাস।

লেবানন থেকে ইসরাইলে রকেট হামলার দাবি করেছে দেশটির সেনাবাহিনী। গত কয়েকদিন ধরে গাজার হামাস সমর্থকরা ইসরাইলে রকেট ছুড়লেও লেবানন থেকে কোনো প্রকার হামলা চালানো হয়নি। লেবানন থেকে রকেট হামলা হামাসের প্রতি প্রতীকী সমর্থনের জন্য চালানো হয়েছে নাকি অন্য কোনো পক্ষ এই 'লড়াইয়ে' হামাসের সঙ্গে যোগ দিয়েছে তা পরিষ্কার নয়। উল্লেখ্য, ওই একটি হামলার জবাবে ইসরাইল ২৫ দফা হামলা চালিয়ে প্রত্যুত্তর দেয়। ২০১২ খ্রিস্টাব্দে নভেম্বরে গাজায় সংঘটিত সহিংসতার পর এটাই সবচেয়ে ভয়াবহ সহিংস রক্তপাতের ঘটনা। ফিলিস্তিনি প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমকে

বলেছেন, 'ইসরাইল আমাদের ভূমি এবং দেশ থেকে বিতাড়িত করতে চায়। তিনি আরো বলেন, ইসরাইলি সেনারা গাজা সীমান্তে বসবাসকারী ফিলিস্তিনিদের তাদের বাড়িঘর ছেড়ে অনেক ভেতরে চলে যেতে বলেছে। কিন্তু আমরা তাদের জানিয়ে দিচ্ছি, নিজের মাটি ছাড়ব না'।

সংবাদমাধ্যমের ভিডিওচিত্রে গাজায় পাশবিক ইসরাইলি হামলার যে দৃশ্য দেখানো হচ্ছে এবং মানবতাশূন্য ইসরাইলিরা উল্লাসের সাথে তা উপভোগ করার যে দৃশ্য দেখানো হয়েছে তাতে যে কোনো মানবতাবাদী মানুষই মর্মাহত হবেন। গাজায় লাশের স্তূপ, অন্যদিকে ইসরাইলে উগ্র ইহুদীদের উল্লাস। একদিকে আর্তনাদ, অন্যদিকে উপভোগ। একজন মরছে, অন্যজন হাসছে। এই একবিংশ শতাব্দীতেও মানুষ কত পৈশাচিক হতে পারে ইসরাইল তা বিশ্ববাসীর সামনে চোখে আঙুল দিয়েই দেখিয়ে দিচ্ছে। সারা বিশ্বের সংবাদমাধ্যম ইসরাইলি পাশবিক হামলার ছবি প্রকাশ করেছে। তাদের নৃশংস হামলা থেকে শিশু, নারী, বৃদ্ধ কেউই রেহাই পাচ্ছেন না। নিষিদ্ধ মারণাস্ত্র রাসায়নিক অস্ত্রও তারা অসহায়, নিরস্ত্র মানুষদের ওপর প্রয়োগ করছে। তাদের পাশবিক হামলার শিকার হয়ে কয়েক ডজন মাসুম ফিলিস্তিনি শিশু পুড়ে অঙ্গার হয়ে যাওয়ার দৃশ্য গণমাধ্যমের বদৌলতে বিশ্ববাসী প্রত্যক্ষ করেছেন। ইসরাইলের এসব নিষ্ঠুরতার দৃশ্য দেখে মানবতাবাদী অনেক ইসরাইলিও জোরালো নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন। কিন্তু পশুর চেয়েও অধম একশ্রেণির ইসরাইলি ফিলিস্তিনি শিশুহত্যার উৎসব পালন করছে। এ বিষয়ে বার্তাসংস্থা আলজাজিরার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম দ্য স্ট্রিমে প্রকাশিত ছবিগুলো দেখলে মানবিক মূল্যবোধ সম্পন্ন কোনো মানুষই ক্ষুব্ধ না হয়ে পারবেন না। ওসব ছবি ইসরাইলি বর্বরতার নিপুন সাক্ষী হয়ে থাকবে। আলজাজিরার দ্য স্ট্রিমে শুক্রবার প্রকাশিত ছবিতে ইসরাইলের এসডেরট এলাকার একটি পাহাড়ের ওপর বসে দল বেঁধে থাকা কিছু মানুষকে সন্ধ্যাযাপন করতে দেখা যাচ্ছিল। প্রথমে স্বাভাবিক সন্ধ্যাযাপন মনে হলেও ছবির নিচের মন্তব্যগুলো পড়লেই তাদের বসে থাকার হেতু স্পষ্ট হয়ে আসে। পাহাড়ের ওপর বসে থাকা এই ইসরাইলিরা গরম সন্ধ্যায় হাওয়া খাওয়া নয়, বরং এই পাহাড় থেকে গাজা সিটিতে ইসরাইলি বিমানবাহিনী কর্তৃক আকাশপথে বোমা ফেলার দৃশ্য দেখছেন! শুধু পৈশাচিক আনন্দ পেতে এই ইসরাইলিরা পাহাড়ের ওপর চেয়ার নিয়ে বসে আছেন। উপভোগ করছেন তাদের বিমানবাহিনীর নিক্ষিপ্ত বোমায় গাজা সিটির ছেলে-শিশু-বৃদ্ধদের আর্তনাদ। বৃহস্পতিবার ছবিটি প্রথম টুইটারে পোস্ট করেন সাংবাদিক অ্যালান সরেন্সন। তিনি ক্যাপশন লিখেন, এসডেরট সিনেমা : ছবিতে দেখা যাচ্ছে, গাজায় দুঃস্বপ্ন জাগানিয়া হামলা দেখতে ভিড় জমিয়েছে ইসরাইলিরা। আলজাজিরায় ছবির বর্ণনায় বলা হয়, গাজা সিটিতে নিক্ষিপ্ত বোমায় মানুষের মরণ আর্তনাদ ভেসে এলেই পাহাড়ে বসে থাকা মানুষ হাততালি আর আনন্দে মেতে উঠছিলেন। সাংবাদিক অ্যালান সরেন্সন জানান, ছবিটি ৯ জুলাই তোলা হয়েছে এসডেরট শহরের একটি পাহাড়ের ওপর থেকে। এরই মধ্যে ছবিটি ফেসবুকে ব্যাপক আলোচনার জন্ম দিয়েছে।

হামাস ও ইসরাইলের মধ্যে একটি অস্ত্রবিরতি আলোচনায় মধ্যস্থতা করতে সহায়তার প্রস্তাব দিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। সহিংসতা বেড়ে চলার প্রেক্ষাপটে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা টেলিফোন করে ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুকে বলেছেন, তার সরকার উভয় পক্ষের মধ্যে একটি অস্ত্রবিরতিতে পৌঁছতে মধ্যস্থতা করতে আগ্রহী। তবে ওবামার উদ্যোগ এখনও দৃশ্যমান হয়নি। এ অবস্থায় মিসর যুদ্ধবিরতির একটি প্রস্তাব দিয়েছিল। কিন্তু তা একপেশে হওয়ায় হামাস মেনে নেয় নি। আবার ইসরাইল একতরফাভাবে মেনে নিলেও ৬ ঘন্টা পর সরে গেছে। প্রসঙ্গত, গাজায় সংঘাত বন্ধে আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে ১৪ জুলাই মিসরের রাজধানী কায়রোতে জরুরি বৈঠকে বসেন আরব পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা। বৈঠক শেষে মিসরের পররাষ্ট্রমন্ত্রী তিন ধাপের যুদ্ধবিরতির পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করেন। ওই প্রস্তাবে বলা হয়, ১২ ঘন্টার মধ্যে উভয় পক্ষ শর্তহীনভাবে যুদ্ধবিরতি কার্যকর করবে। গাজার সীমান্ত খুলে দেয়া হবে। এরপর কায়রোতে দুই পক্ষই ৪৮ ঘন্টার মধ্যে আলোচনায় বসে পূর্ণাঙ্গ চুক্তিতে পৌঁছবে। কিন্তু প্রস্তাবিত ওই সময় অতিক্রমের আগেই প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর নেতৃত্বে ইসরাইলের মন্ত্রিসভা ১৫ জুলাই মঙ্গলবার সকালে (স্থানীয় সময়) যুদ্ধবিরতি চুক্তি গ্রহণের পক্ষে (৬-২) ভোট দেয়। প্রধানমন্ত্রীর দফতর থেকে দাবি করা হয়, সকাল ৯টায় যুদ্ধবিরতি কার্যকর হয়েছে। ইসরাইলের দুটি টেলিভিশন চ্যানেল ও কয়েকটি সংবাদ সংস্থাও এদিন বিভিন্ন স্থানে ইসরাইলি সৈন্যদের বিশ্রাম নেয়ার ছবিও প্রকাশ করে। কিন্তু স্থানীয় সময় বিকাল ৩টা নাগাদ গাজার দুটি লক্ষ্যবস্তুতে বিমান হামলা চালায় ইসরাইল। এর কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে দেশটির প্রতিরক্ষা বিভাগ ও সেনাবাহিনীর দুই কর্মকর্তা

দাবি করেন, আমরা তাদের ওপর আক্রমণ করতে বাধ্য হয়েছি। হামাস যুদ্ধবিরতি মানেনি। বরং আমাদের লক্ষ্য করে ৫০টি রকেট হামলা করেছে। ফিলিস্তিনের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস মিসরের এ পদক্ষেপকে (যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব) স্বাগত জানালেও প্রস্তাবের ব্যাপারে গাজার হামাস কর্তৃপক্ষ এ নিবন্ধ লেখা পর্যন্ত কোনো আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া জানায়নি। হামাসের সামরিক শাখা কাশেম ব্রিগেডের পক্ষ থেকে প্রস্তাবটি 'আত্মসমর্পণ' সমতুল্য আখ্যা দিয়ে এদিন তা নাকচ করা হয়। কাশেম ব্রিগেডের পক্ষ থেকে বলা হয়, শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই চলবে।

জাতিসংঘ মানবাধিকার কমিশন বলেছে, গাজায় ইসরায়েলি হামলায় যেভাবে বেসামরিক লোকজন মারা যাচ্ছে, তাতে করে সেখানে ইসরাইল আন্তর্জাতিক আইন মেনে চলছে কিনা তা নিয়ে গুরুতর সংশয় দেখা দিয়েছে। কমিশনের প্রধান নাভি পিল্লাই বলেছেন, ইসরাইলকে যে কোন অবস্থাতেই বেসামরিক মানুষজনকে টার্গেট করে হামলা বন্ধ করতে হবে। তিনি আরো বলেন, এসব পরিসংখ্যান দেখে গুরুতর সংশয় দেখা দিয়েছে ইসরাইল আদৌ আন্তর্জাতিক আইন মেনে চলছে কিনা। উল্লেখ্য, ২০১২ খ্রিস্টাব্দে অস্ত্রবিরতির পর উভয় পক্ষ থেকে রকেট কিংবা বিমান হামলা বন্ধ ছিল। কিন্তু সম্প্রতি পরিস্থিতি আবার উত্তপ্ত হতে শুরু করলে হামাসের রকেটের জবাবে ইসরাইল নির্বিচার বিমান হামলা শুরু করে। এসব হামলায় আশ্রয় ও স্বজন হারাচ্ছে কেবল গাজা নগরীর বেসামরিক নারী, পুরুষ ও শিশুরা। সম্প্রতি ইসরায়েলি তিন কিশোরকে অপহরণ ও হত্যার পর উত্তেজনা শুরু হয়। ইসরায়েল এ জন্য হামাসকে দায়ী করলেও তারা তা অস্বীকার করে। পরে ফিলিস্তিনি এক কিশোর একইভাবে অপহরণ ও হত্যার শিকার হওয়ার পর উত্তেজনা নতুন মোড় নেয়। গাজা থেকে রকেট ছোড়া হচ্ছে, এমন অভিযোগ তুলে ইসরায়েল গত মঙ্গলবার 'অপারেশন প্রটেক্টিভ এজ' নামের অভিযান শুরু করে। গাজায় বর্বর ইসরাইলি হামলা বন্ধে আন্তর্জাতিক চাপ এবং জাতিসংঘ আহবান জানালেও তা আমলে নিচ্ছে না ইসরাইল। ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু বলেছেন, গাজা উপত্যকায় ফিলিস্তিনি জঙ্গিদের (আসলে মুক্তিকামী) বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান বন্ধে আন্তর্জাতিক চাপ প্রতিহত করা হবে। তিনি বলেন, ইসরাইল মঙ্গলবার থেকে সেখানে এক হাজারেরও বেশি লক্ষ্যবস্তুতে হামলা করেছে এবং ২০১২ খ্রিস্টাব্দে চালানো অভিযানে যে শক্তি ব্যবহার করা হয়েছিল তা দ্বিতীয়বারের মতো এখন ব্যবহার করা হচ্ছে। ফিলিস্তিনি কর্মকর্তারা বলেছেন, ইসরাইলের বিমান হামলায় এখন পর্যন্ত তিন শতাধিক মানুষ নিহত হয়েছে। ফিলিস্তিনের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় বলেছে, ইসরাইলের সামরিক অভিযানে এখন পর্যন্ত সহস্রাধিক নিরীহ মানুষ আহত হয়েছে। আহতদের বেশিরভাগই বেসামরিক নাগরিক। জাতিসংঘের মানবিক সহায়তাবিষয়ক সমন্বয়ের কার্যালয় জানিয়েছে, গাজায় এ পর্যন্ত নিহতদের মধ্যে ৭৭ শতাংশই বেসামরিক নাগরিক।

গাজায় ইসরাইলি বর্বরতার পেছনে তিন ইসরাইলি তরুণহত্যা এবং হামাসের রকেট হামলার অজুহাত দেখানো হলেও এর নেপথ্য কারণ অন্যটি। প্রথমত, নেতানিয়াহু সরকার কট্টরপন্থীদের সাথে সখ্যকে এই হামলার মাধ্যমে আরো জোরালো করতে চাইছে। দ্বিতীয়ত, ফিলিস্তিনের ঐক্যসরকারকে দুর্বল করে দিতে চায়। অনেক বিশ্লেষকের মতে, ইসরায়েলের এ ধরনের সামরিক অভিযানের পেছনে রয়েছে নেতানিয়াহু সরকারের নিজস্ব দুর্বল অবস্থান। তাঁর সরকারের অংশীদার যে দক্ষিণপন্থী দল-নাফতালি বেনেতের নেতৃত্বাধীন 'জিউয়িশ হোম' (বাইয়েত ইয়ুহিদি)-তারা কয়েক মাস ধরেই ফিলিস্তিনি প্রশ্নে তাদের কঠোর অবস্থানের কারণে প্রধানমন্ত্রীর ওপরে চাপ দিয়ে আসছিল। এ বছরের মে মাসে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী জন কেরির সফরের সময় তাঁর করা এক মন্তব্য নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে টানাপোড়েন তীব্র হয়। জন কেরি মন্তব্য করেছিলেন যে ফিলিস্তিনিদের সঙ্গে মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত না হলে ইসরায়েল এক বর্ণবাদী রাষ্ট্রে পরিণত হবে। জন কেরি পরে তাঁর এ বক্তব্য থেকে সামান্য সরে এলেও তাঁর বক্তব্য ইসরায়েলি রাজনীতিতে ঝড় তোলে। একইভাবে এ বছরের গোড়ায় ইসরায়েলি পার্লামেন্টে এ ভাষণ দেওয়ার সময় ইউরোপীয় পার্লামেন্টের প্রেসিডেন্ট মার্টিন সুলজ অভিযোগ করেন যে ইসরায়েল ফিলিস্তিনিদের চেয়ে বেশি পানি ব্যবহার করছে। প্রসঙ্গত, যেখানে ইসরায়েলিরা দিনে ৭০ লিটার পানি ব্যবহার করে, সেখানে ফিলিস্তিনিরা করে ১৭ লিটার। তার বক্তব্যের প্রতিবাদে বেনেতের দলের সদস্যরা ওয়াকআউট করে। এসব টানাপোড়েনের কারণে নেতানিয়াহুর সরকারকে সব সময়ই ফিলিস্তিন প্রশ্নে কঠোর অবস্থান গ্রহণ করতে হয়। ইসরায়েলের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে যখনই সংকট দেখা দেয়, তখনই গাজায় অভিযান চালিয়ে ক্ষমতাসীনেরা তাদের শক্তি সংহত করার ও জনসমর্থন বাড়ানোর চেষ্টা করে থাকে। হামাস এবং ফাতাহ গোষ্ঠীর মধ্যে মতৈক্যের কারণে যে

জাতীয় ঐক্যের সরকার গঠিত হয়েছে তার প্রতিও একটি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিতে চায় ইসরাইল। ইসরাইল বর্তমানে গাজা উপত্যকায় যে হামলা চালাচ্ছে তার পেছনের কারণ হল, ফিলিস্তিনি নেতৃবৃন্দের ঐক্য ভেঙে ফেলা। হামাস গাজা ভূখণ্ডের একটি জনপ্রিয় সংগঠন। নির্বাচনে তাদের বিপুল বিজয় হয়েছিল। হামাসের সঙ্গে ফিলিস্তিন মুক্তি সংস্থার (পিএলও) আদর্শগত পার্থক্য থাকায় এতদিন পশ্চিমতীর ও গাজা-ফিলিস্তিনের এ দুই অংশ পৃথক পৃথক শাসনাধীনে ছিল। কয়েক মাস আগে পিএলও ও হামাস তাদের অতীতের মতপার্থক্য নিরসন করে একটি ঐকমত্যের সরকার গঠন করে। এর প্রধান হন পিএলও নেতা মাহমুদ আব্বাস। বস্তুত, পিএলও ও হামাস ঐক্যবদ্ধ হওয়ার পর থেকে ইসরাইল মরিয়া হয়ে উঠেছে ফিলিস্তিনের এ রাজনৈতিক ঐক্য ভেঙে দিতে। তাই সামান্য অজুহাতে হামলা চালানো হচ্ছে ফিলিস্তিনিদের ওপর। উল্লেখ্য, ক্ষমতার ভাগাভাগি নিয়ে দ্বন্দ্বের জের ধরে ফিলিস্তিনের দুই অংশ পশ্চিম তীর ও গাজা ২০০৭ খ্রিস্টাব্দের আগস্টে চলে যায় দুটি দলের নিয়ন্ত্রণে। সেই থেকে মাহমুদ আব্বাসের নেতৃত্বে ফাতাহ পশ্চিম তীরে ও খালেদ মেশালের নেতৃত্বে হামাস গাজা শাসন করছিল। এ অবস্থায় গত এপ্রিলে দুই দলের মধ্যে চুক্তি হয়। সে অনুযায়ী নতুন করে নির্বাচনের পর চলতি বছরের শেষ নাগাদ একটি জাতীয় সরকার গঠনের কথা। কিন্তু হামাস-ফাতাহর চুক্তিকে ভালোভাবে নেয়নি ইসরাইল। তাদের মতে, হামাস একটি জঙ্গি সংগঠন। হামাস-ফাতাহ জাতীয় ঐক্যের সরকার হলে সেই সরকারের সঙ্গে শান্তি আলোচনায় যাবে না বলে জানিয়ে দেয় দেশটি। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে ফিলিস্তিন ভূখণ্ডে ইহুদিদের জন্য ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর থেকেই স্বাধীন রাষ্ট্রের দাবিতে ফিলিস্তিনিদের সংগ্রামের শুরু। এরপর থেকে নিয়মিত রক্ত ঝরলেও আজও তাদের সেই স্বপ্ন পূরণ হয়নি। কারণ রাষ্ট্র হিসেবে ফিলিস্তিনের স্বাধীন সত্তা মেনে নিতে রাজি নয় ইসরাইল। অন্য আরো অনেক কারণও রয়েছে। তবে, ইসরাইল এই আগ্রাসনে সাময়িক লাভবান হলেও সবচেয়ে বেশি লাভবান হবে ফিলিস্তিন সরকার, বিশেষত হামাস। কারণ এ যুদ্ধের ফলে মিসরের সঙ্গে হামাসের সম্পর্কের উন্নতি হবে। মিসরের কোনো সরকারের পক্ষেই প্রত্যক্ষভাবে ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়া সম্ভব নয়। ফলে শেষ পর্যন্ত মিসরের সরকার একটা যুদ্ধবিরতির চেষ্টায় উদ্যোগী হতে বাধ্য হবে। একইসঙ্গে মিসরের সাথে গাজার যেসব গোপন সুড়ঙ্গ আছে সে সবও খুলে দিতে বাধ্য হবে মিসর। একইসঙ্গে গাজা আগ্রাসনে ইসরাইল যে বর্বরতা প্রদর্শন করেছে তাতে ফিলিস্তিনিদের প্রতি বিশ্ববাসীর সমর্থন আরো জোরালো হবে।

বিভিন্ন অসিলা বা অজুহাতে ফিলিস্তিনী ভূখণ্ডে বিশেষ করে গাজা উপত্যকায় ইসরাইলী আগ্রাসন, হামলা ও হত্যাকাণ্ড অনেকটাই সাধারণ ঘটনায় পরিণত হয়েছে। নৃশংসতা, বর্বরতা ও প্রতিশোধ গ্রহণের নামে হত্যা ও ধ্বংসকাণ্ড ঘটানোর ক্ষেত্রে ইসরাইলের ইহুদীদের কোনো জুড়ি নেই। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে এ পর্যন্ত ঘটে যাওয়া অসংখ্য ঘটনায় তার প্রমাণ রয়েছে। যারা অসহায় বেসামরিক নিরস্ত্র নাগরিক, বিশেষত উদ্বাস্তু শিবিরে হামলা চালিয়ে বিপুলসংখ্যক মানুষের হত্যা ও শিবির ধ্বংস করতে পারে, তারা কী না করতে পারে! গোপন হত্যা ও রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের জন্মদাতা এই ইহুদী রাষ্ট্রটি ওই অঞ্চলে শান্তি, নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতার হুমকি হিসাবে পরিগণিত। ইসরাইলী তিন কিশোরকে কারা অপহরণ ও হত্যা করে তা স্পষ্ট নয়। অথচ এর দায় ফিলিস্তিনীর ওপর চাপিয়ে প্রতিশোধ হিসাবে ফিলিস্তিনী কিশোরকে অপহরণ করে পুড়িয়ে মারার মতো বর্বরতা প্রদর্শন ইসরাইলী ইহুদীদের পক্ষেই সম্ভব। এখন যে প্রতিদিন বিমান ও ট্যাংক হামলা চালিয়ে বেসামরিক নাগরিক হত্যা করা হচ্ছে, তার পেছনেই বা কি কোনো যুক্তি বা লজিক আছে? হামলা প্রতিহামলা আরও জোরদার হলে আরেকটি ফিলিস্তিনী-ইসরাইল যুদ্ধে তা গড়িয়ে যেতে পারে। এটা যে কোনো বিবেচনায় উদ্বেগজনক। জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি মুন চলমান পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছেন, এই পাল্টাপাল্টি হামলা ভয়াবহ। তিনি হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেছেন, আরেকটি পূর্ণমাত্রার যুদ্ধ চালানোর সামর্থ্য ইসরাইল-ফিলিস্তিন অঞ্চলের নেই। তিনি অবিলম্বে বিরোধের অবসান কামনা করেছেন।

গাজায় ইসরাইলের নির্বিচার হামলা, মানুষ হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞের ব্যাপারে জাতিসংঘের আলাদা কোনো প্রতিক্রিয়া জানা যায় নি। মানুষ হত্যার নিন্দা জানিয়ে অবিলম্বে তা বন্ধের কথা বলা হলেও এখন পর্যন্ত ইসরাইলি হামলা বন্ধে কোনো ধরনের তৎপরতা নেই এই বিশ্বসংস্থার। একক কোনো হামলার ঘটনায় এত মানুষের মৃত্যুর ঘটনা সাম্প্রতিক কালে ঘটেনি। এ নিয়ে জাতিসংঘ সোচ্চার নেই, সোচ্চার নেই ওআইসি, মানবাধিকারের ফেরীওয়ালা বলে চিহ্নিত যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়নও চুপ। এ সুযোগে বেপরোয়া হয়ে উঠছে বর্বর ইসরাইল। জাতিসংঘকে বিশ্বের রাষ্ট্রসমূহের প্রধান অভিভাবক সংস্থা বলা হলেও তা বরাবরই ইসরাইলী

হত্যা-নির্যাতনের বিরুদ্ধে নিম সোচ্চার। এর প্রধান কারণ, বিশ্বের ইহুদী-খ্রীষ্ট শক্তিচক্র সংস্থাটি নিয়ন্ত্রণ করে। তাদের ইচ্ছা-অভিপ্রায়ের বাইরে যাওয়ার ক্ষমতা নেই এই বিশ্ব সংস্থার। আর যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়নসহ পশ্চিমা দেশগুলো যেখানে শুরু থেকে ইসরাইল ও ইহুদীবাদ সুরক্ষায় নিয়োজিত, সেখানে তাদের কাছ থেকে ন্যায্য প্রতিকার ও ন্যায়বিচার আশা করা যায় না। এখন ইসরাইলের বিমান হামলা থেকে মুক্তি পাচ্ছে না শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, দাতব্যপ্রতিষ্ঠান, মসজিদও। গাজা আক্রমণের পঞ্চম দিনে এক প্রতিবন্ধী দাতব্যপ্রতিষ্ঠান ও মসজিদে বোমা নিক্ষেপ করা হয়। পশ্চিম গাজার একটি মসজিদে বিমান হামলার পর ধ্বংসস্তূপ খুঁজে তিনজনের লাশ পাওয়া গেছে।

আমরা মনে করি, ফিলিস্তিনীদের হত্যা-নির্যাতনের বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদ হওয়া দরকার, দরকার স্থায়ী প্রতিকার। ইসরাইলের প্রশ্রয়দাতা দেশ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা এ ব্যাপারে মধ্যস্থতা করার আগ্রহ ব্যক্ত করেছেন। তার এ আগ্রহ ইতিবাচক। তবে তা যেনো ইসরাইলের স্বার্থের অনুকূল না হয় তাও দেখতে হবে। একইসঙ্গে হামলা বন্ধের পাশাপাশি ফিলিস্তিন সমস্যার স্থায়ী সমাধানেও মনোযোগ দিতে হবে। এ ক্ষেত্রে ওআইসি সহ মুসলিম বিশ্বকেই পালন করতে হবে অগ্রণী ভূমিকা। সার্বিকভাবে বিশ্বকে শান্তিময় রাখতে চাইলে ইসরাইলের এই নৃশংসতা বন্ধ করতে হবে। এ জন্য ফিলিস্তিনি ও আরবদের ঐক্যবদ্ধ ভূমিকা নিতে হবে। জাতিসঙ্ঘ ও বিশ্ব শক্তিগুলোকে দ্বৈত নীতি বাদ দিয়ে ফিলিস্তিনে প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর হতে হবে। তা না হলে আরব এলাকার বিশাল অঞ্চলজুড়ে বৃহত্তর ইসরাইল প্রতিষ্ঠার যে স্বপ্ন নেতানিয়াহুরা দেখছে তা বাস্তবায়ন করতে গিয়ে অগ্নিবলয় সৃষ্টি হবে মধ্যপ্রাচ্যে। সে আগুন থেকে কেউ রক্ষা পাবে না। আমরা মনে করি, এ সমস্যার একমাত্র ন্যায়সঙ্গত সমাধান হল একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম ফিলিস্তিন রাষ্ট্র। এ ব্যাপারে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় নানা প্রতিশ্রুতি দিয়ে এলেও কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নেয়নি। প্রকারান্তরে ইসরাইলের স্বার্থই রক্ষা করে এসেছে তারা। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় বিশেষত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কঠোর ভূমিকা নিলে এবং মুসলিম দুনিয়া ইসরাইলের পাশবিক হত্যাযজ্ঞের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ফিলিস্তিনিদের ন্যায়সঙ্গত দাবি মানতে বাধ্য করলে ফিলিস্তিন সমস্যার সমাধান কোনো কঠিন বিষয় নয়। ইসরাইলের ওপর যথাযথ আন্তর্জাতিক চাপে বর্তমান গাজায় গণহত্যাও বন্ধ হতে পারে।

সূফি উদ্ধৃতি

■ যারা দুনিয়াকে শুধু একটি আমানতের মালের মত মনে করেন, তারা প্রয়োজন কালে অনায়াসে ইহা আমানতের মালিকের হাতে সোপর্দ করে চলে যেতে পারেন। তাদের মনে কোনরূপ দুঃখ অশান্তির সৃষ্টি হয় না।

■ যে পার্থিব গৃহকে ভেঙ্গে চুরে দিয়ে ভগ্নস্তূপের উপর পারলৌকিক সৌধ রচনা করে, আর পার্থিব মোহাবিষ্ট হয়ে পারলৌকিক সৌধ ভেঙ্গে তার উপর পার্থিব প্রাসাদ রচনায় নিয়োজিত হয় না, মূলতঃ সে লোকই হল প্রকৃত বুদ্ধিমান।

–হযরত হাসান বসরী (রাহ্)

■ যার আয়ু শুধু রূহ ও আত্মার উপর নির্ভরশীল, রূহ বা আত্মার বিদায় গ্রহণের সাথে সাথে তার আয়ু শেষ হয়– সে মৃত্যুবরণ করে কিন্তু যার আয়ু বা জীবন আল্লাহ তা'লার উপর নির্ভরশীল, তার কখনও মৃত্যু ঘটে না বরং সে অপ্রকৃত যিন্দেগী থেকে প্রকৃত যিন্দেগী অর্জন করে মাত্র।

–হযরত জুনায়েদ বাগদাদী (রাহ্)

■ আমি কখনও দুনিয়াদারের কাছে বসা পছন্দ করি না এবং তাদের সঙ্গে সংসর্গ স্থাপন করা ভালবাসি না।

■ সন্দেহজনক বস্তু থেকে পরহেজ করা ও অন্তরকে সদা নিয়ন্ত্রণে রাখাই পরহেজগারী।

–হযরত বিশর হাফী (রাহ্)

শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) বৃত্তি পরীক্ষা ২০১৪-এর ফলাফল ঘোষিত

সম্প্রতি শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) বৃত্তি তহবিল আয়োজিত বৃত্তি পরীক্ষা ২০১৪-এর ফলাফল ঘোষণা করা হয়েছে। স্কুল ও কলেজ বিভাগে ২৬ জন এবং মাদ্‌রাসা বিভাগে মোট ১৬ জন সর্বমোট ৪২ জন ছাত্র-ছাত্রী বৃত্তির জন্য নির্বাচিত হয়েছে। ঘোষিত ফলাফল নিম্নরূপঃ

স্কুল ও কলেজ বিভাগ: **৫ম শ্রেণিঃ** রাহনুমা তাসনিম লামচি, পিতা-মোহাম্মদ আবদুল মালেক, কাটিরহাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। জিয়াউল হক জিয়া (পিয়াল), পিতা-মোহাম্মদ হারুন উর রশিদ, পূর্ব বাকলিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। আল মোমিন রাহাত, পিতা-মোহাম্মদ নুরুল আবছার, বারমাসিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। জেরিন সুলতানা (রিকা), পিতা-বজল আহমদ, বারমাসিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। **৬ষ্ঠ শ্রেণিঃ** সৈয়্যদা ফারজানা জাহান ইমা, পিতা-মোহাম্মদ তফজ্জল হোসেন, ফটিকছড়ি পাইলট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়। মোহাম্মদ শাহিনুর অভি, পিতা-নুর মোহাম্মদ, চট্টগ্রাম সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়। জয়ব্রত দে, পিতা-গান্ধী দে, মসজিদ্দা উচ্চ বিদ্যালয়। **৭ম শ্রেণিঃ** তাজ উদ্দীন আহম্মদ, পিতা-মোহাম্মদ আলাউদ্দীন, বারমাসিয়া আবদুল করিম উচ্চ বিদ্যালয়। সানজিদা মমতাজ, পিতা-মোহাম্মদ ওয়াইজ করিম, কৃষ্ণকুমারী সিটি কর্পো. বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়। জেবা ফারজানা, পিতা-মোহাম্মদ আবদুল হামিদ, চট্টগ্রাম সরকারি বালিয়া উচ্চ বিদ্যালয়। মোহাম্মদ আরিফুর রহমান, পিতা-মোহাম্মদ মাহাবুল আলম, বারমাসিয়া আবদুল করিম উচ্চ বিদ্যালয়। **৮ম শ্রেণিঃ** মোহাম্মদ ওবাইদ জাহাঙ্গীর, পিতা-মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম, মাদ্‌রাসা-ই-গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী। ইসরাত জাহান, পিতা-আমজাত হোসেন, শেরশাহ্ কলোনী ডা. মাজাহারুল হক উচ্চ বিদ্যালয়। আহমদ উল্লাহ, পিতা-মোহাম্মদ দিদারুল আলম, কাটিরহাট উচ্চ বিদ্যালয়। **৯ম শ্রেণিঃ** জয়া আচার্য্য, পিতা-রতন আচার্য্য, পাথরঘাটা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়। জয় সাহা, পিতা-দুলাল সাহা, বারমাসিয়া আবদুল করিম উচ্চ বিদ্যালয়। মোহাম্মদ রিয়াজ উদ্দিন, পিতা-মোহাম্মদ রফিকুল আলম, দামপাড়া এম এল হাই স্কুল। **১০ম শ্রেণিঃ** মোহাম্মদ রবিউল করিম, পিতা-মোহাম্মদ হারুন অর রশিদ, পশ্চিম গোমদণ্ডী ইউনিয়ন উচ্চ বিদ্যালয়। মোহাম্মদ এনামুল হক, পিতা-মোহাম্মদ ইলিয়াছ, জাফরাবাদ উচ্চ বিদ্যালয়। মোহাম্মদ জিয়াউদ্দীন চৌধুরী (জিসান), পিতা-মোহাম্মদ জসিম উদ্দীন চৌধুরী, পশ্চিম গোমদণ্ডী ইউনিয়ন উচ্চ বিদ্যালয়। **একাদশ শ্রেণিঃ** মর্জিনা আকতার, পিতা-ফরিদুল আলম, স্যার আশুতোষ সরকারি কলেজ। মোহাম্মদ মুনির উদ্দিন সিকদার, পিতা-মরহুম মোহাম্মদ ইউছুপ সিকদার, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ। মোবারক হোসেন রাহাত, পিতা-মোজাহারুল হক, বেপজা পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ। **দ্বাদশ শ্রেণিঃ** সাবরিকা মমতাজ, পিতা-মোহাম্মদ ওয়াইজ করিম, এনায়েতবাজার সরকারি মহিলা কলেজ। উম্মে সালমা, পিতা-আবদুল মালেক, সরকারি হাজী মুহাম্মদ মহসিন কলেজ। আসমাউল মাওয়া আফরিন, মরহুম একরামুল হক, কাটিরহাট মহিলা ডিগ্রী কলেজ।

মাদ্‌রাসা বিভাগঃ আলিমঃ মুহাম্মদ মুনির উদ্দীন, চট্টগ্রাম নেছারিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসা। মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া। মুহাম্মদ আবু ইউসুফ, মাদ্‌রাসা-এ-গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (আলিম)। নাদিয়া আক্তার, ফটিকছড়ি জামেউল উলুম ফাজিল ডিগ্রী মাদ্‌রাসা। মোহাম্মদ ইউসুফ, মাদ্‌রাসা-এ-গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (আলিম)। তানজিনা পারভিন, ফটিকছড়ি জামেউল উলুম ফাজিল ডিগ্রী মাদ্‌রাসা। মুহাম্মদ মুনিরুল ইসলাম, পশ্চিমচাল ইসলামিয়া ফাযিল মাদ্‌রাসা। মোহাম্মদ রেজাউল মোস্তফা ইব্রাহিম, জামেয়া রহমানিয়া ফাযিল মাদ্‌রাসা। মুহাম্মদ ইসমাইল, কাটিরহাট মুফিদুল ইসলাম ফাযিল মাদ্‌রাসা। মুহাম্মদ রাশেদ উল্লাহ, কাটিরহাট মুফিদুল ইসলাম ফাযিল মাদ্‌রাসা। শারমিন সুলতানা রূপা, ফটিকছড়ি জামেউল উলুম ফাজিল ডিগ্রী মাদ্‌রাসা। **ফাজিলঃ** তানভীর আহমদ সিদ্দিকী, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া। শামিমা আক্তার, ফটিকছড়ি জামেউল উলুম ফাজিল ডিগ্রী মাদ্‌রাসা। সালমা আক্তার, পশ্চিমচাল ইসলামিয়া ফাযিল মাদ্‌রাসা। দেওয়ান মোর্শেদ আলী, আহসানুল উলুম জামেয়া কামিল মাদ্‌রাসা। মিশকাতুন নেছা, পশ্চিম চাল ইসলামিয়া ফাযিল মাদ্‌রাসা।

হযরত খাজা শেখ ফরিদ উদ্দিন গঞ্জেশকর (রহঃ)-এর এককালীন অবস্থানস্থলকে ঘিরে অপূর্ব স্থাপত্য শৈলী সম্পন্ন "শেখ ফরিদের চশমাখ্যাত" মসজিদ ও মিনার, ষোলশহর ২নং গেইট, চট্টগ্রাম।

চট্টগ্রাম ষোলশহর ২নং গেইট হযরত খাজা শেখ ফরিদের চশমাখ্যাত পানির কূপ।

THE MONTHLY ALOKDHARA REGD. NO CHA-272 PRICE : 15.00

শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) ট্রাস্ট-এর নিয়ন্ত্রণাধীনে পরিচালিত বহুমাত্রিক কল্যাণমুখী প্রতিষ্ঠানসমূহ

শিক্ষা ও শিক্ষাবৃত্তি প্রকল্প :

১. মাদ্‌রাসা-এ-গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী।
২. উম্মুল আশেকীন মুনাওয়ারা বেগম এতিমখানা ও হেফজখানা।
৩. শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) বৃত্তি তহবিল।
৪. মাইজভাণ্ডার শরীফ গণপাঠাগার।
৫. গাউসিয়া হক ভাণ্ডারী ইসলামিক ইন্‌স্টিটিউট, পশ্চিম গোমদন্ডী, বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম।
৬. শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) স্কুল, শান্তিরদ্বীপ, গহিরা, রাউজান, চট্টগ্রাম।
৭. মাদ্‌রাসা-এ-শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী, হামজারবাগ, বিবিরহাট, পশ্চিম ষোলশহর, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম।
৮. শাহানশাহ্ হক ভাণ্ডারী ফোরকানিয়া মাদ্‌রাসা, পাটিয়ালছড়ি, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।
৯. শাহানশাহ্ হক ভাণ্ডারী দায়রা শরীফ ফোরকানিয়া মাদ্‌রাসা, সুয়াবিল, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।
১০. মাদ্‌রাসা-এ-শাহানশাহ্ হক ভাণ্ডারী, বারমাসিয়া, বৈদ্যেরহাট, ভুজপুর, চট্টগ্রাম।
১১. শাহানশাহ্ হক ভাণ্ডারী ফোরকানিয়া মাদ্‌রাসা, ফতেপুর, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।
১২. শাহানশাহ্ হক ভাণ্ডারী দায়রা শরীফ ফোরকানিয়া মাদ্‌রাসা, চরখিজিরপুর, বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম।
১৩. মাদ্‌রাসা-এ-শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী, খিতাপচর, বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম।
১৪. জিয়াউল কুরআন ফোরকানিয়া মাদ্‌রাসা ও ইবাদাতখানা, চরখিজিরপুর (ট্যাক্সঘর), বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম।
১৫. শাহানশাহ্ হক ভাণ্ডারী ফোরকানিয়া মাদ্‌রাসা, মেহেরআটি, পটিয়া, চট্টগ্রাম।
১৬. জিয়াউল কুরআন সুন্নিয়া ফোরকানিয়া মাদ্‌রাসা, এয়াকুবদণ্ডী, পটিয়া, চট্টগ্রাম।
১৭. শাহানশাহ্ হক ভাণ্ডারী দায়রা শরীফ ফোরকানিয়া মাদ্‌রাসা, চন্দনাইশ (সদর), চট্টগ্রাম।
১৮. বিশ্বঅলি শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) হাফেজিয়া সুন্নিয়া মাদ্‌রাসা, হাটপুকুরিয়া, বটতলী বাজার, বরুড়া, কুমিল্লা।
১৯. মাদ্‌রাসা-এ-বিশ্বঅলি শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) হেফজখানা ও এতিমখানা, মনোহরদী, নরসিংদী।
২০. শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) ইসলামি একাডেমি হাইদগাঁও, পটিয়া, চট্টগ্রাম।
২১. জিয়াউল কুরআন নূরানী একাডেমি পূর্ব লালানগর গাউসিয়া হক ভাণ্ডারী দায়রা শরীফ, পূর্ব লালানগর, ছোট দারোগার হাট, সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম।

দাতব্য চিকিৎসাসেবা প্রকল্প :

১. হোসাইনী ক্লিনিক (মাইজভাণ্ডার শরীফ)।

দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থিক সহায়তা প্রকল্প :

১. যাকাত তহবিল।
২. দুস্থ সাহায্য তহবিল।

মাইজভাণ্ডারী আদর্শগত গবেষণা ও প্রকাশনা প্রকল্প :

১. মাসিক আলোকধারা।
২. মাইজভাণ্ডারী একাডেমি।

সংগীত ও সংস্কৃতি চর্চা প্রকল্প :

১. মাইজভাণ্ডারী মরমী গোষ্ঠী।
২. মাইজভাণ্ডারী সংগীত নিকেতন।

জনসেবা প্রকল্প :

১. দৃষ্টিনন্দন যাত্রীছাউনী, মুরাদপুর মোড়, চট্টগ্রাম।
২. নাজিরহাট তেমুহনী রাস্তার মাথায় যাত্রী ছাউনী ও ইবাদাতখানা।
৩. শানে আহমদিয়া গেইট সংলগ্ন যাত্রী ছাউনী।
৪. ন্যায্যমূল্যের হোটেল (মাইজভাণ্ডার শরীফ)।